KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 X 24.13 C.m.
Vol. & Number: ৫১/১ ৫১/2 ৫১/৩ ৫১/৪	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯৭ ॥ May 1990 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ॥ Jun 1990 আষাঢ় ১৩৯৭ ॥ July 1990 শ্রাবণ ১৩৯৭ ॥ Aug 1990
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor আবদুর রউফ	Remarks :

CD Roll No KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ১ মে ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৪৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

"সাম্যবাদের সংকট" সন্দর্ভে অধ্যাপক অম্লান দত্ত পরীক্ষিত সাম্যবাদের গোড়ার গলদ খুঁজতে গিয়ে দেখিয়েছেন সাম্যবাদের মতাদর্শের ছকেই নিহিত ছিল সংকটের বীজ।

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন—"মার্কসীয় দর্শন জিজ্ঞাসা—একটি স্মৃতিচারণ"।

ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের শিকড় সন্ধান করেছেন ভারতের ধর্মীয় সমাজগুলির অভ্যন্তরেই। কারণ, গোষ্ঠী কিংবা বর্ণগত বিদ্বেষভাব এদের মজ্জাগত।

কীর্তনের সুরে বাঙালির হৃদয় আকর্ষিত হয় জাতপাতের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এক দিব্য মিলনক্ষেত্রে। এই কীর্তনের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে অধ্যাপক বিজিতকুমার দত্তের দীর্ঘ আলোচনা।

মানুষের স্বর্ণলালসার পরিণতি কী দাঁড়ায়, কিভাবে সোনার চেয়ে আলোর দাম বেশি হয়ে ওঠে—এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টিগুলির পর্যালোচনা করেছেন ড. পিনাকী ভাদুড়ী।

চিত্রশিল্পী সমীর ঘোষের সন্দর্ভের বিষয়বস্তু—আধুনিকতার প্রশ্নে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ এবং চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিহিত দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের কারণসমূহ।

দলিত সাহিত্যের একটি গল্প এবং গল্পকারের পরিচয়।

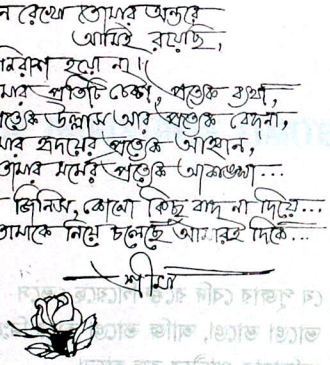

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক কথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ১
মে ১৯৯০
বৈশাখ ১৩৯৭

সাম্যবাদের সংকট অম্লান দত্ত ১
মার্কসীয় দর্শনজিজ্ঞাসা সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১০
সোনার চেয়ে আলোর দাম বেশি পিনাকী ভাদুড়ী ২০
রবীন্দ্রনাথ : লেখা ও রেখায় আধুনিকতার দ্বন্দ্ব সমীর ঘোষ ২৬

উজান-যাত্রা মতি মুখোপাধ্যায় ১৬
লেলিহান সনেট খসরু পারভেজ ১৭
বিধিনিষেধে শৌনক বর্মণ ১৮
দরজা খোলা, এসো গৌতম হাজরা ১৯

বলি অবিনাশ ঢোড়স ৩৯
পাগলের প্রলাপ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৪৪

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৫২
নিজধর্মের প্রতিও বিদ্বেষ দিব্যজ্যোতি মজুমদার

গ্রন্থসমালোচনা ৬২
বিজিতকুমার দত্ত, সন্তোষকুমার দে, সনাতন মিত্র,
কিরণশঙ্কর মৈত্র, প্রত্যূষপ্রসূন ঘোষ

মতামত ৭৯
সুনীল সেন

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

WITH COMPLIMENTS FROM

INDIAN CAN PRIVATE LIMITED

6, MIDDLETON STREET
CALCUTTA-700071

Telephones : 29-2306
29-2307

সাম্যবাদের সংকট

অম্লান দত্ত

এক

সাম্য নিয়ে মানুষের মনে বহুকালের একটা স্বপ্ন আছে। মার্কসের মনেও ছিল। তাঁর পূর্ববর্তী কল্পসাম্যবাদীদের চিন্তার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরবর্তী ভিন্নপন্থী কিছু মহান ব্যক্তিত্ব, ক্রুপৎকিন থেকে গান্ধী, এই সঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের সকলের মনেই আদর্শ সমাজের একটা চিত্র ছিল।

সেই কল্পিত সাম্য নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। দৃশ্যমান পরীক্ষিত সাম্যবাদই আমাদের আলোচনার বিষয়। মার্কস শুধু একটা কল্পিত সাম্যবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি। তিনি সেই কল্পনাকে বাস্তব করে তুলতে চেয়েছিলেন। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা পথের সন্ধান তিনি দিতে চেয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, এইরকমই তিনি মনে করতেন। কল্পসাম্যবাদীদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর পার্থক্য, এই কথাটা তিনি জোরের সঙ্গে বলে গিয়েছিলেন।

মার্কস যে পথ দেখিয়েছিলেন সেই পথে একাধিক দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। যাঁরা এই চেষ্টা করেছেন তাঁরা অন্তত নিজেদের মার্কসবাদী মনে করতেন। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পর থেকে স্তালিনের মৃত্যু অবধি পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষ লেনিন ও স্তালিনকে বিশ্বাসযোগ্য মার্কসবাদী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রথমে রুশদেশে এবং তারপর আরো অনেক দেশে মার্কসবাদকে আশ্রয় করে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেটাই এযুগের চোখে কমিউনিস্ট দুনিয়া বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে। সাম্যবাদের এটাই পরিচিত রূপ। যেহেতু এই পরীক্ষা চলেছে সবচেয়ে দীর্ঘকাল ধরে সোভিয়েত দেশে, কাজেই আমাদের আলোচনায় ওই দেশটিকে প্রাধান্য দেওয়া অসঙ্গত হবে না। সাধারণভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয়, সাম্যবাদের সংকট।

ধনতন্ত্রের সংকট বহু দিনের আলোচিত বিষয়, সাম্যবাদের সংকট নতুন। এটাই স্বাভাবিক। ধনতন্ত্র বহুদিনের পুরনো ব্যবস্থা, সাম্যবাদ নতুন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই পরীক্ষিত সাম্যবাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস গত কয়েক বছরে প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছে। সাম্যবাদী সমাজের ভিতর যারা বড়ো হয়ে উঠেছে তাদের মনেই আজ অবিশ্বাস সবচেয়ে প্রবল। পুরনো প্রজন্মের চেয়েও নতুন প্রজন্মের ভিতর এটা আরো বেশি স্পষ্ট। চীনের ছাত্রছাত্রী চীনা সাম্যবাদে আস্থা হারিয়েছে। সোভিয়েত দেশের মানুষ সোভিয়েত সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় আস্থা হারিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের ছাত্র-

শ্রমিকসহ অধিকাংশ মানুষ পরীক্ষিত সাম্যবাদকে পরিত্যাগ করছে।

এদেশের কিছু পুরনো সাম্যবাদী পুরনো স্তালিনি ব্যবস্থার প্রতি আজও শ্রদ্ধাবান। তাঁরা বলছেন, ধনতান্ত্রিক অপপ্রচারে সাম্যবাদী দেশের মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ওই মানুষেরা নিশ্চয়ই নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই বিচার করছেন। কমিউনিস্ট ব্যবস্থার ভিতর যাদের জন্ম, ওই ব্যবস্থাকে আজীবন যারা ভিতর থেকে ভালো করে দেখেছে, তাদের কাছেই ওই ব্যবস্থা আজ অশ্রদ্ধেয়। অনেক মার্কসবাদী বলছেন, কমিউনিস্ট দুনিয়ার কিছু নেতা ভুল করেছেন; সেটা ব্যক্তির ভুল, সাম্যবাদী ব্যবস্থায় মূলত কোনো ভুল নেই। তাঁরা আরো বলছেন, সাম্যবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিটা নির্ভুল, উপরতলায় কিছু দোষ দেখা দিয়েছে। কমিউনিস্ট দুনিয়ার মানুষ কিন্তু নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অন্য কথা বলছেন। তাঁরা পরিবর্তন চাইছেন, পুনর্গঠন চাইছেন, শুধু উপরতলার নয়, ভিত্তিরও। যুক্তির দিক থেকে মৌল পরিবর্তনের পক্ষের কথাটাই বেশি জোরালো। চীনে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপের প্রধান-প্রধান প্রতিটি সাম্যবাদী দেশে নেতারা দোষী আর সমাজব্যবস্থা মূলত নির্দোষ, এটা বিশ্বাস করতে গেলে যুক্তিকে বিসর্জন দিতে হয়। নির্দোষ সমাজব্যবস্থা দোষী নেতাদের ক্ষমতাবান করে তুলেছে—এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। সমাজব্যবস্থার ভিতরই আজকের অবস্থার কারণ খুঁজতে হবে। বিশেষত এই সংকট যখন দেখা দিয়েছে একটি দুটি দেশে নয়, কমিউনিস্ট দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে, তখন সমাজ-ব্যবস্থাকে দোষ না দিয়ে নেতৃত্বকে বা ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া "বৈজ্ঞানিক" নয়।

ঘটনার প্রতি বৈজ্ঞানিক অমনোযোগী হন না। তিনি থিওরি বা তত্ত্বকে ঘটনা ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ক্রমাগত মিলিয়ে নেন। প্রয়োজনে পুরনো তত্ত্বকে সংশোধন করেন, নতুন তত্ত্ব গ্রহণ করেন। কোনো বিশেষ থিওরিকে রক্ষা করতে তিনি ব্যস্ত নন, তিনি সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত।

কমিউনিস্ট দুনিয়ার অনেক ঘটনার সঙ্গে মার্কস-বাদীর মূল ধারণাগুলি অনেকদিন থেকেই মিলছিল না। অনেকদিন থেকেই এইসব অবাধ্য ঘটনাকে বাধ্য মার্কসবাদীরা শত্রুপক্ষের প্রচার বলে অগ্রাহ্য করছিলেন। ১৯৮৯ সালে এই ঝোঁকটা চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছল। এদেশের অনেক মার্কসবাদীরই প্রথমে মনে হয়েছে, পূর্ব ইউরোপের ঘটনাগুলি আসলে ঘটে নি, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে ওইসবের অস্তিত্ব, বাস্তব জগতে নয়। যা তাঁরা আদৌ বিশ্বাস করতে চান নি, তাত্ত্বিক পূর্বকল্পনার সঙ্গে যা কিছুতেই মিল-ছিল না, তাও যখন শেষ অবধি সত্য প্রমাণিত হল, তখন যে-কোনো সৎ বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য পুরনো তত্ত্বকে পুনরায় বিচার করে দেখা। অনেক মার্কসবাদীই এটা করতে মনে-মনে প্রস্তুত নন। বিশ্বাস রক্ষা করাই বিপ্লবীর প্রধান কর্তব্য, এইরকমের একটা চিন্তা হয়তো তাঁদের অধিকার করে আছে। কিন্তু সত্যকে অগ্রাহ্য করে, চিন্তার জড়তাকে আশ্রয় করে, কোনো সার্থক বিপ্লবই সম্ভব নয়।

দুই

মার্কস শিখিয়েছিলেন, শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীটাকে, গোটা ইতিহাসকে, দেখতে। এটাই বিপ্লবীর পক্ষে সঠিক দৃষ্টিকোণ। অন্য কোনো দৃষ্টি-কোণ থেকে বিপ্লব নিয়ে চিন্তা অ-মার্কসীয়, অতএব ভ্রান্ত। এটাই মার্কসবাদীর মৌল বিশ্বাস।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ধনিক ও শ্রমিক—এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ধনিকের হাতে আছে মূলধনের মালিকানা, শ্রমিকের হাতে শুধু তার শ্রমশক্তি। শোষণের মূলে আছে মালিকানার এই অসাম্য। মার্কস-লেনিনের মতে—রাষ্ট্র হল একটা নিপীড়নের যন্ত্র। শোষকশ্রেণী এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে একান্ত-ভাবে শ্রেণীস্বার্থে, অর্থাৎ শোষণ অব্যাহত রাখবার জন্য। ধনতন্ত্র বেড়ে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃহৎশিল্পের অভ্যন্তরেই গড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণী, যার জন্য ইতিহাসে নির্দিষ্ট আছে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা। শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্তব্য হল ধনিকশ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্র-যন্ত্রের কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়া।

বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ। রাষ্ট্রযন্ত্রকে এবার শ্রমকশ্রেণী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী গঠন করে নেবে। এখনও সেটা নিপীড়নের যন্ত্র, তবে এর কর্তৃত্ব এখন শ্রমিকশ্রেণীর হাতে, এর ব্যবহার ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। ধনিক-শ্রেণীকে নির্মূল করতে সময় লাগবে, পুরনো শোষক-শ্রেণী আবারও ক্ষমতায় ফিরে আসবার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবে। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবার জন্যই সাময়িকভাবে প্রয়োজন হবে শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটর-শিপ। এই পরামর্শ মার্কসের লেখাতে স্পষ্টভাবেই দেওয়া আছে।

লেনিন বুঝেছিলেন যে, বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য একটা বিশেষ ধরনের বৈপ্লবিক দল আবশ্যক। কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বেই শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারে। শুধু মজদুর ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে এই কাজটা সম্ভব নয়। মজদুরসংস্থা মজুরির প্রশ্নেই জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাদখলের কাজের জন্য চাই মার্কসবাদী বৈপ্লবিক দৃষ্টি ও বৈপ্লবিক সংগঠন। এজন্য আবশ্যক কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব।

১৯১৭ সালের ফেবরুয়ারি মাসে রুশদেশে পুরনো স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাচ্যুত হল। লেনিন তখন স্বদেশে উপস্থিত ছিলেন না। যাঁরা নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন তাঁদের ভিতর প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কেরেন্স্কি, মতামতের দিক থেকে তিনি অনেকটা ইউরোপের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মতো, গণতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিছুদিন পর লেনিন দেশে এলেন। তাঁর নেতৃত্বকৌশলে কয়েক মাসের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, অক্টোবর/নভেম্বর বিপ্লবের পথে ক্ষমতা এল বলশেভিক দলের হাতে। লেনিনের দল তখনও দেশের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করে নি, বিশেষত গ্রামের মানুষের ভিতর কমিউনিস্ট-দের ভিত্তি তখন দুর্বল। তবে শ্রমিকশ্রেণীর একাংশ ও সৈন্যবাহিনীর ভিতর ওই দলের প্রভাব ছিল উল্লেখ-যোগ্য। আর ছিল সাংগঠনিক দৃঢ়তা ও নিপুণ নেতৃত্ব। আরো ছিল দেশময় বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য এই যথেষ্ট।

বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত হল শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটর-শিপ, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের দাবি নিয়ে কমিউনিস্ট দলের ডিক্টেটরশিপ। প্রথম দিকে অন্য যেসব দল ছিল, অতি দ্রুত তাদের দমন করা হল। কিছুদিনের ভিতরই কার্যত একদলীয় শাসন শুরু হল, যদিও তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এসেছে আরো পরে। ১৯৮৯ সাল অবধি চলেছে শ্রমিকশ্রেণীর নামে কমিউনিস্টদের একদলীয় ডিক্টেটরশিপ।

বিপ্লবের পর কয়েক মাসের মধ্যেই প্রধান-প্রধান সব শিল্পেই রাষ্ট্রের মালিকানা স্থাপিত হল। মার্কসের ভাবধারার সঙ্গে এটার স্পষ্ট সঙ্গতি আছে। "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"তে মার্কস লিখেছিলেন: 'The proletariat will use its political supremacy to wrest, by degrees, all capital from the bourgeoisie, to centralise all instruments of production in the hands of the state.' রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত করাই যে মার্কসের নির্দেশ ছিল, সে কথা স্পষ্ট। তবে ওই সময়ে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের কারণে কাজটা আরো দ্রুত হয়ে উঠেছিল। পরে কিছু-কিছু শিল্পকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে অল্প সময়ের জন্য বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্তালিনের নেতৃত্বে আবারও রাষ্ট্রীয়

তথা একদলীয় শাসন সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট স্বৈরতন্ত্র স্তালিনের যুগেই স্থায়ী রূপ ধারণ করে।

একটা প্রধান ও বহুবিতর্কিত প্রশ্ন এরপর এসে যায়। শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপের ভিতরই কি তার অধঃপতন ও বিকৃতির কারণ নিহিত? অনেকে এই অধঃপতনের জন্য স্তালিনকে দোষী করেছেন। কেউ-কেউ লেনিনকেও দায়ী করেছেন। ইতিহাসের বড়ো বড়ো ঘটনার এইরকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা অন্তত মার্কসবাদী দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

স্তালিনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছোটো করে দেখবার মতো নয়। ট্রটস্কি-বুখারিনের মতো বহু প্রসিদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি খুন করিয়েছিলেন। বস্তুত, লেনিনের সময় কমিউনিস্ট দলের যেটা ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি তার অধিকাংশ সদস্যই স্তালিনের আমলে খুন হন। এটা জঘন্য অপরাধ। আরো আশ্চর্যের কথা, পৃথিবীময় বহু কমিউনিস্ট এই অপরাধটাকে দেখেও দেখেন নি, এর ভিতরই তাঁরা এক উচ্চতর গণতন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন, স্তালিনকে পুজোর বেদিতে বসিয়েছেন। এই ঘটনার ব্যাখ্যা কী? একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে। অনেক কমিউনিস্টই মেনে নিয়েছিলেন যে, স্তালিনের খুনি নীতি শুধু অনিবার্যই নয়, সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলকে রক্ষা করবার জন্য তার প্রয়োজনও ছিল। যে-কোনো উপায়ে দলের হাতে ক্ষমতা রক্ষা করাটাই প্রধান কর্তব্য, এই রকমই স্তালিনসহ বহু সাম্যবাদীর বিশ্বাস ছিল। বিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বুখারিনের সঙ্গে স্তালিনের মতভেদের প্রধান ব্যাপারটা এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। কৃষকদের প্রতি কমিউনিস্ট দল তথা সোভিয়েত রাষ্ট্রের নীতি নিয়ে সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল। স্তালিন জোরজবরদস্তি করে যৌথ খেত-খামার গড়ে তুলতে চাইলেন। আসলে জোরজবরদস্তি ছাড়া দেশময় এ কাজটা দ্রুত করা সম্ভব ছিল না, করতে চাইলে ওটাই পথ। বুখারিন ভিন্ন প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, গরিব চাষীদের নিয়ে যৌথ চাষ গড়ে তোলা যাক, সচ্ছল কৃষকদের নিজ-নিজ উদ্যোগে কাজ করতে দেওয়া হোক। স্তালিনের নীতিই গৃহীত হল। অনেকে বলেছেন, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য এটা আবশ্যক ছিল। এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। স্তালিন যে পথে এগিয়েছিলেন তাতে অতি শীঘ্র দেশময় লক্ষ-লক্ষ লোককে অনাহারে মরতে হয়, কৃষির উৎপাদন উল্লেযোগ্যভাবে পিছিয়ে যায় আর পরবর্তী বহু বছরের জন্য সোভিয়েত কৃষিব্যবস্থার জন্য একটা কঠিন সমস্যা তৈরি হয়ে থাকে। বুখারিন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা মেনে নিলে সোভিয়েত দেশের খাদ্যোৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পেত। বর্ধিত কৃষিজ উৎপাদনের ভিত্তিতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হত কিনা, তা নিয়ে অনেক আলোচনা সম্ভব। কোনো-কোনো দেশে সেটা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক, সেই তর্কে আমরা যাচ্ছি না। আসলে স্তালিনের নীতির সপক্ষে অন্য একটা বড়ো যুক্তি ছিল; সেটা অর্থনীতির নয়, রাজনীতির যুক্তি।

বুখারিনের প্রস্তাব গৃহীত হলে সচ্ছল কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হত, গ্রামাঞ্চলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি হত। সেই কৃষকদের ভিতর থেকেই আবার কমিউনিস্ট দলের বিরোধী শক্তির মাথা তুলে দাঁড়াবার আশঙ্কা ছিল। কাজেই বুখারিনের প্রস্তাব দলীয় স্বার্থের বিরোধী। স্তালিনপন্থীদের এই যুক্তির কোনো উত্তর সেদিন দলের ভিতর থেকে দেওয়া সহজ ছিল না। কৃষকদের ভিতর কমিউনিস্ট দলের নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার জন্য যৌথ খামার ও স্তালিনি সন্ত্রাসের নীতি সেদিন আবশ্যক মনে হয়েছিল। বিপ্লব ও সাম্যবাদের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য অর্থাৎ কমিউনিস্ট দলের একনায়কতন্ত্র মজবুত করা দরকার, এটাই সাম্যবাদের যথার্থ পথ—স্তালিনের অনুগামীরা একথাটাই মেনে নিয়েছিলেন।

লেনিন ছিলেন গণতান্ত্রিক আর স্তালিন স্বৈরতান্ত্রিক, এরকম একটা কথা মাঝে-মাঝেই শোনা যায়। কিন্তু যে-কোনো মূল্যেই হোক কমিউনিস্ট দলের স্বার্থ রক্ষা করাই সর্বোচ্চ নীতি, এ বিশ্বাস শুধু স্তালিনের নয়, লেনিনেরও। অন্য দলের প্রতি গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতার স্থান বিপ্লবী দর্শনে ছিল না। মার্কসবাদীদের ভিতর মতবিরোধ ঘটলে তখনও লেনিনের আক্রমণ ও যুক্তিপ্রয়োগ হত "ফৌজি", নির্মম ও আপসহীন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত-স্বার্থদুষ্ট ছিল না। আর স্তালিনের তুলনায় তর্কে তিনি অনেক বেশি দক্ষ ছিলেন।

অকটোবর / নভেমবর বিপ্লবের নায়ক ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবেই লেনিন। যে অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে তাঁর দল ক্ষমতা লাভ করে তাতে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অগ্রণী ভূমিকার কথা অনেকেই জানেন। পেত্রোগ্রাদের সোভিয়েতে বলশেভিক দলের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সারা দেশে ওই দলের প্রতি সমর্থন ছিল সীমাবদ্ধ। বিপ্লবের পর কিছুদিনের মধ্যেই যে সংবিধানসভা (Constituent Assembly) নির্বাচিত হয়, তাতে লেনিনের দল লাভ করে মোট আসনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ। এই সংবিধানসভাকে লেনিন কাজ করতে দেন নি। কিছুদিনের ভিতরই সংগঠিত হয় "চেকা", প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সন্ত্রাসের অস্ত্র। এইসব লেনিনের মতানুসারেই হয়েছে। এ ব্যাপারে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক রকমের যুক্তিসঙ্গতি আছে, সেটা উপেক্ষা করা যায় না। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সহিষ্ণুতার নীতি রক্ষা পায় না। কমিউনিস্ট পার্টির হাতে ক্ষমতা রক্ষা করবার জন্যই বিপক্ষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ("terror") ব্যবহার করা হয়। লেনিন ওই শব্দটিই ব্যবহার করেন এবং তার সপক্ষে যুক্তি দেখান।

এইসব উপায়ে কমিউনিস্ট দলের হাতে ক্ষমতা রক্ষা পেল বটে, কিন্তু সাম্যবাদের আদর্শ রক্ষা পেল না। সাম্যবাদের সংকটের মূল এইখানে।

সাম্যবাদী মতাদর্শে আশ্রিত এবং একদলীয় শাসন ও সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের ক্ষমতায় রক্ষিত যে রাজনীতিক ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ কমিউনিস্ট দুনিয়ায় গড়ে উঠেছে, সেই সবই আজ সেই সমাজের বিকাশের পথে বাধা হয়ে উঠেছে, মানুষের সৃজনীশক্তিকে শৃঙ্খলিত করেছে।

তিন

সোভিয়েত দেশে যে শাসনব্যবস্থা আকার পেয়েছে, অল্পবেশি উপযোজনসহ সেটাই অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশেও গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব দেশেই কার্যত কমিউনিস্ট দলের একচ্ছত্র শাসন। সামান্য যেসব পার্থক্য এখানে-সেখানে দেখা যায়, তার গুরুত্ব কম। কমিউনিস্ট শাসনে রাষ্ট্র ও শাসকদলের ভিতর পার্থক্য মুছে যায়। একদলীয় শাসনে ক্ষমতার অতি-কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তার কথা বলা হয় বটে, কিন্তু অতিদ্রুত গণতন্ত্র দুর্বল ও কেন্দ্রীয়তা প্রবল হয়ে ওঠে, এটাই ঘটনা। এই ঘটনাকে অস্বীকার করা ভুল, তাতে বাস্তব অবস্থা-কেই অস্বীকার করা হয়। এর পরিণতিও আজ সুস্পষ্ট সেটা লক্ষ করা যায়। ক্ষমতার কেন্দ্রীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চনীচভেদ বেড়ে ওঠে। আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আমলাতন্ত্রের আকার ও প্রবলতা বেড়ে চলে। আমলাতন্ত্র এ যুগে অনেক দেশেই উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত, কিন্তু একদলীয় শাসনে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের ভিতর রাখা বিশেষ কঠিন হয়ে ওঠে। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটর-শিপের নামে গড়ে উঠেছে একদলীয় আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রসর্বস্ব অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থাকে কখনো "উচ্চতর গণতন্ত্র", কখনো "শোষণমুক্ত সমাজ" বলা হয়েছে। প্রধান-প্রধান কমিউনিস্ট দেশগুলির মানুষ এইসব পুষ্পিত বর্ণনায় আর মুগ্ধ বোধ করে না, বরং রাষ্ট্রের প্রচারে তারা একেবারেই আস্থা হারিয়েছে। চীনের ছাত্রসমাজ যখন গণতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন করে তখন চীনের তথাকথিত গণতন্ত্রে যে গণতন্ত্রের বড়োই অভাব,

একথাটাই প্রকাশ পায়। শোষণ সম্বন্ধেও একই কথা। মালিকানার ব্যবস্থাটা এখানে ভ্রান্তি ঘটায়। রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই শোষণ বন্ধ হয় না। শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল ভোগ করে রাষ্ট্র-যন্ত্রে অধিষ্ঠিত বিশেষ সুবিধাভোগী এক "নয়া শ্রেণী"। পার্টির কর্তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করছেন—এ কথাটা যতই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, ততই সুবিধাসন্ধানী মানুষেরা পার্টিতে প্রবেশ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পার্টির ভিতর ও আমলাতন্ত্রে দুর্নীতি বেড়ে ওঠে। এই বাস্তব অবস্থাটাকে "শোষণমুক্ত সমাজ" বলে বর্ণনা করে তৃতীয় বিশ্বের কিছু মানুষকে হয়-তো ভোলানো যায়, কিন্তু কমিউনিস্ট দেশের মানুষকে ভোলানো ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠে। মস্কোর "নিউ টাইম্‌স্" পত্রিকার এক লেখক সম্প্রতি বলেছেন, "শোষণ" শব্দটা আজকাল লোকভোলানো বক্তৃতা ("demagogy")-র ভাষা হয়ে উঠেছে। মার্কসবাদীদের ভিতর এ নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে।

শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কতন্ত্র অথবা কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রের যে অধঃপতন আমাদের সময়ের এক প্রধান অভিজ্ঞতা, তার জন্য যেমন কেউ-কেউ স্তালিনের মতো ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দিয়েছেন, তেমনি আবার কেউ-কেউ গত কয়েক দশকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে এইজন্য দায়ী করেছেন। বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশকে বেষ্টিত করে ছিল ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। এই ধনতান্ত্রিক বেষ্টনের ফলে সাম্যবাদী ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে নি, এটাই শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কতন্ত্রের বিকৃত গঠনের একটা প্রধান কারণ। এ যুক্তিটা তুচ্ছ করবার মতো নয়। এ নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে।

বাস্তব অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেই মার্কস সাম্যবাদে পৌঁছবার পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিপ্লবের পরও ধনিকশ্রেণীর প্রতিরোধ অনেকদিন ধরে চলবে—এটা মার্কসের চিন্তার ভিতরই ছিল। আর সেজন্যই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপের প্রয়োজন দেখেছিলেন। একটা ব্যাপার অবশ্য মার্কসের প্রত্যাশার বাইরে ঘটে যায়। তিনি ভেবেছিলেন, বিপ্লব ঘটবে এমন কোনো দেশে যেখানে ধনতন্ত্র অনেকটা পরিণত রূপ লাভ করেছে, রুশদেশে বিপ্লব এইদিক থেকে অনেকটা আকস্মিক ঘটনা। নভেম্বর বিপ্লবের পরও সেদিনের কমিউনিস্ট নেতারা আশা রেখেছিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপের কিছু-কিছু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে। সেই আশা পূর্ণ হয় নি।

সোভিয়েত দেশে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে কিছুদিনের ভিতরই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ ঘটে। সোভিয়েত রাষ্ট্র কিন্তু সেই বিপত্তি কাটিয়ে ওঠে। নতুন সাম্য-বাদী দেশের পক্ষে ওই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সময়। এর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিকভাবে আত্মরক্ষার শক্তি ক্রমশ বেড়ে চলে।

১৯২৯ সালে স্তালিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল যখন জবরদস্তিমূলক কৃষিনীতি গ্রহণ করে, তখন যুদ্ধের ও আত্মরক্ষার যুক্তিটা অন্যভাবে এসে যায়। বলা হয়েছে যে, সামরিক প্রয়োজনে ভারী শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি তখন জরুরি হয়ে উঠেছিল। জার্মানিতে তখনো হিটলারের ক্ষমতায় আসতে কয়েক বছর দেরি আছে। ক্ষমতাসীন জার্মান সোস্যাল-ডেমো-ক্রাটিক বা সমাজবাদী-গণতান্ত্রিক দল সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে স্তালিনের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করেন, তিনি নাৎসি দলের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা আগে থেকেই বুঝতে পেরে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঘটনা কিন্তু এই যে, কমিউনিস্ট দল ওই সময়ে নাৎসি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জার্মান সমাজবাদী-গণতান্ত্রিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করছিল। এর ফল ভালো হয় নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সফল আত্মরক্ষা এবং পূর্ব-ইউরোপে বিজয়-অভিযানের কথা সকলেরই জানা আছে। এজন্য স্তালিনকে বিশেষ কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে দুয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। সেদিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতি ঘটেছে। কিন্তু জার্মানি সোভিয়েত দেশকে স্থায়িভাবে পদানত করতে পারবে, এমন কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ধনতান্ত্রিক মার্কিনদেশের অর্থ-ও অস্ত্রবল তখন সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশের সপক্ষে। এ অবস্থায় শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক, জার্মানির পরাজয় অনিবার্য ছিল। রুশ দেশটা ভৌগোলিক দিক থেকে এতই বিশাল যে জার্মানির পক্ষে সেই দেশ স্থায়িভাবে দখল করে রাখা অসম্ভব ছিল। রুশদেশের সাধারণ মানুষের স্বদেশপ্রেমের কথাও এখানে স্মরণে রাখতে হবে। আফগানিস্তানের মতো ছোটো দেশও এই স্বদেশপ্রেমের শক্তিতে সোভিয়েত দেশের মতো প্রবল প্রতিপক্ষকে হটিয়ে দিয়েছে। জার্মানিও রুশ-দেশ থেকে হটতে বাধ্য হয়েছে, এটাই অনিবার্য, এজন্য কোনো বিশেষ নেতার গৌরব বড়ো করে দেখানো অতিরিক্ত বীরপুজো। স্তালিনের কৃতিত্ব এই যে, লাল ফৌজকে তিনি পূর্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশ অধিকার করে নিতে দিয়েছিলেন, আর সেইসব দেশে কমিউনিস্ট শাসন চাপিয়ে দিয়েছিলেন। 'বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না।' বিপ্লব নয়, কিন্তু কমি-উনিস্ট শাসন সেদিন রপ্তানি করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা জনসমর্থন লাভ করে নি। তারই পরিণতি দেখা গেল অবশেষে ১৯৮৯ সালে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষার খাতে ক্রমাগত বিপুল অর্থব্যয় শেষ হল না। শুরু হয়ে গেল দীর্ঘ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ। যুদ্ধের আয়োজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই বৃহৎ শক্তির কেউই তখন পেছিয়ে যেতে রাজি নয়। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের যুক্তি, পশ্চিম-ইউরোপকে আগ্রাসী কমিউনিস্ট শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। স্তালিনের যুক্তি, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আবারও কমিউনিস্ট দেশগুলিকে ঘিরে ফেলছে, সর্বশক্তি দিয়ে এই অবরোধ প্রতিহত করতে হবে। মার্কসবাদ ব্যাখ্যা করে স্তালিন বললেন যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের ভিতর যুদ্ধ অনিবার্য, আবার ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী শিবিরের ভিতরও দ্বন্দ্ব অনিবার্য। যুদ্ধের অনিবার্যতার এই তত্ত্ব নিয়ে স্তালিনপন্থীরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ত্রেঝনেভের আমলেও মোটামুটি এই ধারাটাই চলছিল।

এরই ভিতর দিয়ে সোভিয়েত দেশে জঙ্গি অর্থ-নীতি ও স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত হল, গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হল আর সাম্যবাদী আদর্শের বিকৃতিও দূর করা গেল না।

অথচ যুদ্ধ-সংক্রান্ত স্তালিনি তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সম্পর্ক ছিল দুর্বল।

প্রধান-প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভিতর যুদ্ধোত্তর যুগে একই সঙ্গে ছিল সহযোগ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। ১৯৫২ সালে স্তালিন এই দেশগুলির ভিতর যে যুদ্ধের অনিবার্যতার কথা বলেছিলেন, সে যুদ্ধ বাস্তবে ঘটে নি। পশ্চিম-ইউরোপ ও জাপানের অর্থনীতি মার্কিন সাহায্য নিয়েই বৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। মার্কিন দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছে, কিন্তু সেটা যুদ্ধের পথে যায় নি।

সোভিয়েত দেশ ধনতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা বিপজ্জনকভাবে বেষ্টিত, যে-কোনো সময়ে আক্রমণ আসতে পারে, যুদ্ধ সমাসন্ন ধরে নিয়েই সাম্যবাদী শিবিরকে প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এই উত্তেজক তত্ত্বও কোরিয়া বা ভিয়েতনামের মতো কিছু প্রত্যন্তযুদ্ধের বাইরে বাস্তব ঘটনার দ্বারা তেমন সমর্থিত হয় নি। বরং ঘটনার স্রোত অনেকটা বিপরীত দিকেই বইছিল। স্তালিনের মৃত্যুর পর এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সৌভাগ্যের কথা সোভিয়েত ইউনিয়নের

ভিভরও এ কথাটা বুঝবার মতো লোকের অভাব ছিল না।

স্তালিনের মৃত্যুর আগেই উনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে মালেনকভ বললেন, 'Comrades, the Soviet Union is no longer a lone oasis surrounded by capitalist countries. We are moving forward together with the great Chinese people, together with many millions of the People's Democracies. Our mighty country is in the flower of its strength.' এর কিছুকাল পরই অবশ্য চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে চিড় ধরে যায়। কিন্তু মালেনকভের মূল উপলব্ধিটা তাতে ভুল হয়ে যায় না। সেই সূত্র ধরে চিন্তা স্বচ্ছ হয়ে উঠতে অবশ্য অনেকটা সময় লাগে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শৈশবে যদি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাকে সংহার করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, সোভিয়েত দেশ যখন পৃথিবীর একমাত্র সাম্যবাদী দেশ তখনও যদি জঙ্গি জার্মানশক্তি তাকে ধ্বংস করতে অক্ষম হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একাধিক সাম্যবাদী দেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যখন তার সামরিক শক্তিও আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে গেছে, তখন ধনতান্ত্রিক দেশের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাটা বড়ো করে দেখানো একই সঙ্গে অবাস্তব এবং শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক।

একথাটা গর্বাচভ পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন। তিনিই স্তালিনি তত্ত্ব দ্বিধাহীনভাবে ত্যাগ করেন এবং বিশ্বশান্তির জন্য নতুনভাবে উদ্যোগী হন। এই উদ্যোগ জঙ্গি মার্কসবাদীদের ভালো লাগে নি। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক বিষয়ে এইখানে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদয় আমরা দেখতে পাই। নতুন সোভিয়েত পার্লামেন্টের সামনে মহান বৈজ্ঞানিক সাখারভের বক্তৃতায় এই স্বচ্ছদৃষ্টির অতি সরল উচ্চারণ আমরা পাই যখন তিনি বলেন, 'The danger of a military attack on the Soviet Union disappeared long ago." সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সশস্ত্র আক্রমণের সম্ভাবনা অনেকদিন আগেই দূর হয়ে গেছে।

শাসকদল অনেক সময়ে নিজের স্বার্থে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা বড়ো করে দেখায়। জঙ্গি ধনতন্ত্র ও জঙ্গি মার্কসবাদ উভয়ে মিলেই এই ধারাটাকে জোরালো করেছে।

চার

মার্কস ও লেনিন যে পথ দেখিয়েছিলেন সেই পথে শ্রমিকশ্রেণীর নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে নয়, কিন্তু পিছিয়ে-পড়া কিছু দেশে বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হয়েছে। এটাই অতীতের সাক্ষ্য। কিন্তু ওই পথে সাম্যবাদী আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। এযাবৎ ঘটনার সাক্ষ্য একথাই বলে। বিশ্বাসী মার্কসবাদী এর বেশি কিছু দাবি করেন। কিন্তু সেটা নিতান্তই বিশ্বাসের কথা, পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কথা নয়। ঘটনার ভিত্তিতে এর বেশি দাবি করা যায় না। এটাই স্বীকার করা দরকার। এই স্বীকৃতির ফলে সাম্যবাদী আদর্শের মূল্য কমে যায় এমন নয়। কিন্তু আদর্শের রূপায়ণের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞতা মেনে নেওয়া হয়। এরও মূল্য আছে।

আপাতত কমিউনিস্ট দুনিয়া এগিয়ে যেতে চাইছে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এক ধরনের সমন্বয়ের দিকে। এটাকে সাম্যবাদী আদর্শ বলা যায় না। কিন্তু এদিকেই এখন সাম্যবাদী দেশগুলির গতি। গ্লাসনস্ত নিয়ে চীন ও সোভিয়েত দেশের নেতাদের ভিতর মতের পার্থক্য আছে। কিন্তু পেরেস্ত্রোইকা নিয়ে ততটা পার্থক্য নেই। পেরেস্ত্রোইকার একটা লক্ষ্য হল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাছ থেকে শিক্ষা

গ্রহণ করা, তার কিছু মূল জিনিস সাম্যবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা। যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক বাজার-ব্যবস্থা। সমালোচকেরা অবশ্য বলেন যে, ধনতান্ত্রিক বাজারেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, সেখানে ঝোঁক একচেটিয়া ব্যবসার দিকে। কিন্তু সাম্যবাদী দেশের নেতারা দেখছেন যে, যতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক বাজারব্যবস্থা ধনতন্ত্রে আছে, তাতেও অনেকটা কাজ হচ্ছে। সাম্যবাদী অর্থনীতিতে বিরাজ করছে রাষ্ট্রসর্বস্বতা, হুকুমদারি ব্যবস্থা, তাতে কাজে গুরুতর বাধা পড়ছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি বহু আলোচনা হয়েছে।

একদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব যদি স্বীকার্য হয়, তবে অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবও উপেক্ষা করা যায় না। সেই প্রভাবে ধনতন্ত্র ক্রমে-ক্রমে ভিতর থেকে বেশ খানিকটা পালটে গেছে। দরিদ্রতম ও দুর্বলতম নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের কিছু বিশেষ দায়িত্ব আজ স্বীকৃত। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে, এমনকী কম উন্নত কোনো-কোনো দেশেও, সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে, যদিও সব দেশে সেটা সমান পর্যাপ্ত নয়। শ্রমিকসংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মালিক বা ম্যানেজার সাধারণ কর্মীর সঙ্গে পুরনো দিনের মতো যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন না। তা ছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরই ব্যক্তিগত বা বে-সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ কমবেশি গড়ে উঠেছে, তার পরিমাণ এখন আর উপেক্ষণীয় নয়।

ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র হচ্ছে দুই পরস্পরবিরোধী বৈরী সমাজব্যবস্থা, এটাই মার্কসবাদীর অভ্যস্ত দৃষ্টি-কোণ। কিন্তু দুই সমাজব্যবস্থার সমন্বয়মুখিতা এখন বাস্তব ঘটনা। আমরা পছন্দ করি বা না করি, একে অস্বীকার করা যাবে না। এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের নতুন করে চিন্তা শুরু করতে হবে।

একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে রাখা ভালো। এ-যুগের দুই প্রধান আর্থিক ব্যবস্থার ভিতর আমাদের চিন্তাকে আবদ্ধ রাখলে ভুল করা হবে। কিছু বড়ো সমস্যা আজকের পৃথিবীতে আছে, ধনতন্ত্রের সঙ্গে সেসব জড়িয়ে গেছে তবু তাদের একটা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আবশ্যক। যেমন ধরা যাক, বর্ণবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। মার্কিন দেশে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ মানুষ কৃষ্ণাঙ্গকে সমান মর্যাদায় মেনে নেয় নি। ভারতেও কিন্তু বর্ণ নিয়ে আভিজাত্যবোধ আছে। আমাদের মতো বর্ণসচেতন দেশ কমই আছে, কালো মেয়ের বাবা-মা সেটা ভালোভাবেই জানেন। এটাকে ধনতন্ত্রের সমস্যা বলে ধরে নিলে বিচারে বিভ্রম থেকে যাবে। বিশুদ্ধ শোষণের প্রবৃত্তি গাত্রের বর্ণ বিচার করে না। বর্ণ-বিচারের মূল অন্য কোথাও। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সম্বন্ধেও একই কথা। কোনো এক সময় অনেকে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে, সাম্যবাদী দেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই। আজ আর সেকথা বলবার উপায় নেই।

আরো কিছু নিদারুণ সমস্যা আছে, সামাজিক ব্যবস্থার সীমানা ডিঙিয়ে সারা বিশ্বে সংক্রামক ব্যাধির মতো সেসব ছড়িয়ে পড়েছে। এইরকম এক সমস্যা, অতিরিক্ত মদ্যপান ও নেশাগ্রস্ততা। এইসব সমস্যা যেমন দেশবিশেষে সীমিত নয় তেমনি বিশেষ শ্রেণীতেও আবদ্ধ নয়। মানুষের চেতনার গভীরে আছে অন্য কোনো দ্বন্দ্ব, অন্য এক যন্ত্রণা। সে নিজেই নিজেকে কুরে খায়।

বিশশতকী ধনতন্ত্র আর এই শতাব্দীর পরীক্ষিত সাম্যবাদের কোনো সমন্বয় দিয়েই এইসব সমস্যা দূর করা যাবে না। শ্রেণীদ্বন্দ্বের কোনো তত্ত্বের ভিতরও এসবের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ আমরা যাকে সাম্যবাদের সংকট বলছি সেটা সভ্যতার গভীরতর সংকটের অংশমাত্র। মতাদর্শ নিয়ে এই শতাব্দীর পুরনো ঝগড়া পিছনে ফেলেই মানুষের চিন্তাকে এগিয়ে যেতে হবে।

মার্কসীয় দর্শনজিজ্ঞাসা—একটি স্মৃতিচারণ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এক

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে মার্কসীয় দর্শনকে জানতাম "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" (Dialectical Materialism) হিসাবে। ছোটো-ছোটো পুস্তিকায় ডায়ালেকটিকস-এর ব্যাখ্যা থাকত। হেগেল ভালো করে পড়ি নি, কিন্তু বেশ লাগত শুনতে যে হেগেল মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে, পা উঁচুতে রেখে চলতেন তাঁর দর্শনে। মার্কস-এঙ্গেলস এসে, হেগেল-দর্শনকে উলটে দিয়ে মাটির পৃথিবীতে স্থাপন করলেন। তারপর অ্যাডোরেটস্কি (Adoratsky), পলিটজার (Politzer), র‍্যালফ ফক্স (Ralph Fox), রাহুল সাংকৃত্যায়নের "বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ" পড়েছি, মরিস কর্নফোর্থের মার্কসীয় দর্শনের উপর লেখা বইগুলি পড়েছি। সকলেই সূত্রাকারে বুঝিয়েছেন মার্কসের দর্শন—"মেটিরিয়ালিজম" (বস্তুবাদ), কিন্তু যান্ত্রিক (mechanical) মেটিরিয়ালিজম নয়, দ্বন্দ্বাত্মক (dialectical)। তখন আমার কাছে History of C.P.S.U. (B) (বলশেভিক পার্টির ইতিহাস) প্রায় বাইবেলের মতোই ছিল। একে তো স্তালিনের লেখা, তাই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ভাবতাম কত সহজভাবে, কত দুরূহ তত্ত্বই না আলোচনা করেছেন মহান নেতা। ওই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত "দ্বন্দ্বাত্মক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" (Dialectical & Historical Materialism) পড়ে তখন অভিভূত হয়েছিলাম। প্রসন্ন, গম্ভীর লেখা; সূত্রাকারে বস্তুবাদ—এক দুই তিন চার করে বৈশিষ্ট্যের তালিকা; "ডায়ালেকটিকস"—আবার এক দুই তিন করে বৈশিষ্ট্যের হিসাব। যেন পরীক্ষার্থীর জন্য সহজ, "একের মধ্যে দুই" ঢঙে "মার্কসীয় দর্শন" লিখেছেন প্রাজ্ঞ নেতা। খুবই ভালো লেগেছিল বইখানা ১৯৪৮-৪৯ সালে। তখন আমার মন্ত্রমুগ্ধতার দিন। শাস্ত্রবোধের জন্যও যে শ্রবণের পর "মনন"-"বিচার", নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ প্রয়োজন, এ বোধও তখন আমার ছিল না।

প্রথম আঘাত পেলাম ইতালির দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচের (Croce) একটি প্রবন্ধ পড়ে। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি স্তালিনের ওই ছোট্ট পুস্তিকার যে সংস্করণ প্রকাশ করে ১৯৪৪ সালে, নেপল্‌স্ নগরী থেকে, তার এক কপি উপহার হিসাবে পৌঁছয় ক্রোচের হাতে। ক্রোচে লিখেছেন—'নেপল্‌স্ এমন একটি নগরী যে নগরীতে মনস্বীদের সুর্যস্নাত মূর্তি শোভা পাচ্ছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে আছে টমাস অ্যাকুইনাস, গিয়োর্ডেনো ব্রুনো এবং ভিকো-র মূর্তি। এই নামগুলি স্মরণে থাকলে এ ধরনের স্থূল, অর্বাচীন একটি পুস্তিকা আমায় উপহার দেওয়া কেন? পুস্তিকাটিতে দার্শনিক বিভ্রমের ভীতিপ্রদ বোঝা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

I have been courteously presented with a copy of a litte work which I received with the welcome that a literary curiosity deserves, since it was translated and printed in Naples, a city where the Sun shines on the statues of Thomas Aquinas, Giordano Bruno and Vico. These names might surely at least have suggested something less naive than the confused heap of horrid philosophical fallacies which fill its pages. [*My Philosophy* : Croce, পৃ ৬৪]

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের—বিশেষত স্তালিন ব্যাখ্যার সমালোচনা করে ক্রোচে লিখেছিলেন, 'আমি যে এই দর্শনের সমালোচনা করলাম তার অর্থ এই নয় যে, মার্কস এবং তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্তালিন এমন মানুষ যাঁদের বিশেষ গুরুত্ব নেই। আমাদের যুগের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে এঁদের যে দান ছিল এবং থাকবেও, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুঃখটা প্রবল হয়ে ওঠে এজন্যই যে, এঁদের, বিশেষত শেষের তিনজনকে জনপ্রিয় কৌতুক-নাটকের (farce) বিদূষক হিসাবে দেখাতে হচ্ছে। কিন্তু কী-ই বা করার আছে? যদিও গ্যারিবল্ডি কিছু অশ্লীল কবিতা ও ছোটোগল্প লিখেছিলেন, তবুও তিনি গ্যারিবল্ডি তো বটে। সাহিত্যের ইতিহাসে ওঁর নাম না থাকুক, তাতে কী এসে যায়!

This is not to deny that Marx and his faithful and industrious disciple Engels as well as Lenin and Stalin are men of great importance who have counted and still count for much in the social and political history of our times. It is the more grievous to have to treat them, especially the last three, as on the level of clowns in some popular farce. But what is one to do? Garibaldi is still Garibaldi though he wrote vile verses and stories which find no mention in any history of literature. [Benedetto Croce : *My Philosophy*. George Allen & Unwin Ltd : 1951, p 66]

প্রবন্ধের শেষে ক্রোচে আশা প্রকাশ করেছেন যে, কমিউনিস্টরা আধা-দর্শন (pseudo-philosophy) এবং আধা-বিজ্ঞান (pseudo-science)-কে পরিহার করে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের "যুক্তি" ও "বিচারে"র প্রশস্ত রাজপথ ধরে অগ্রসর হবে, বর্জন করবে তাদের "অন্ধবিশ্বাস" ও "সংকীর্ণতা"।

And since we have champions of Communism among our neighbours, I cannot refrain from expressing the hope that they will free themselves from these superstitions and sectarian formulas which are not philosophy or science but pseudo-philosophy and pseudo-science. (ওই, পৃষ্ঠা ৪৭)।

সত্যি কথা বলতে কী, ক্রোচের মন্তব্য পড়ে সে যুগে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত হয়েছিলাম। একটা সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম মনকে প্রবোধ দিতে। বুর্জোয়া ভাববাদীরা মার্কসবাদের কুৎসাই করে। এটা তো মতাদর্শগত সংগ্রামেরই অঙ্গ। কিন্তু তখন থেকেই মনে নানা জিজ্ঞাসার উদয় হচ্ছিল। খুব বেশি পড়ি নি, কিন্তু মার্কস-সাহিত্যে কোথাও তো

"ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম" নামে কোনো দর্শনের কথা পাচ্ছি না। ব্যাপারটা কী? মার্কস তো প্রকৃতির ডায়ালেকটিকসের কথা বলেন নি, অথচ এঙ্গেলস তো "ডায়ালেকটিকস অব নেচার" (Dialectics of Nature) বলে বই লিখেছিলেন। ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজমের সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সম্পর্কটা কী? ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেই "প্রকৃতির ডায়ালেকটিকস" মানতে হবে কেন? এই দুটির নৈয়ায়িক সম্পর্ক কেমন?

এসব নানা প্রশ্ন মনে জাগত। আমার অন্যতম শিক্ষক প্রয়াত আবু সয়ীদ আইয়ুব এই ধরনের নানা কূট দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন তুলতেন। মার্কসবাদে পটু রাজনৈতিক নেতা আর দু-একজন বিদ্বানের সঙ্গে আইয়ুব সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি আমি। ডায়ালগের বন্দোবস্ত করেছি। দেখেছি, নেতারা কিংবা বিদ্বানেরা আইয়ুব সাহেবের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারছেন না। এতে আমার বিভ্রান্তি আর সংশয় ক্রমশ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দোদুল্যমানতা চলেছে অনেকদিন। অ-মার্কসবাদীর কাছে মার্কসবাদীরা পরাভূত হচ্ছে দেখে তখন লজ্জিত হয়েছি।

১৯৬৩ সালে সরকারি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে আমার "নতুন স্বাধীনতা" লাভ হল। ক্রমশ উপলব্ধি হল এই পার্টি মন্ত্রবদ্ধ, শাস্ত্রবদ্ধ পার্টি—সমকালীন, কিন্তু আধুনিক নয়। ১৯৬০ সাল থেকে মতাদর্শের অবসানেরও যুগ, সারা দুনিয়ায়। স্তালিন তখন মৃত। খ্রুশ্চেভের মৃদু হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে পোলিশ, চেকোশ্লোভাক, হাঙ্গেরীয় বুদ্ধিজীবী সমাজ। ওইসব দেশে সার্ত্রের (Sartre) এগসিস্টেনশিয়াল মতবাদ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলছে তখন। সার্ত্রের একটি অনুপম কথায় নতুন আলো দেখতে পেলাম সেই যুগে।

'মার্কসবাদই এ যুগের একমাত্র দর্শন। কিন্তু মতান্ধতা ও সংকীর্ণতায় আবিল হয়ে এই দর্শনের স্রোতোধারা গেছে শুকিয়ে। এর পঙ্কিল স্রোতোধারাকে আবর্জনামুক্ত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন গভীর খননকার্য (dredging)। খননকার্য সম্পাদন করবে এগসিস্টেনশিয়ালিজম। মানুষের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, অনন্যতার স্বীকৃতির সাধন-উপকরণ দিয়ে। তাহলেই জন্ম নেবে মানবিক মার্কসবাদ, গতিশীল মার্কসবাদ। তখনই শুধু এগসিস্টেনশিয়ালিজম মিশে যাবে মার্কসবাদে।' [*Critique of Dialectical Reason* দ্রষ্টব্য]।

তখন থেকে অল্পস্বল্প সার্ত্রে-দর্শন পাঠের শুরু। বোধ হয় সেটা ১৯৬৫ সাল। লন্ডনের অধ্যাপক অ্যাকটনের একখানা বই, নাম—*Illusion of the Epoch* হাতে এল। মার্কসবাদী দর্শনের—প্রধানত তথাকথিত রাশিয়ার "ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজমে"র দার্শনিক বিচার। খুব ভালো লাগল, কিন্তু বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পেল। কিছুকাল পরে হাতে এল পোলানডের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও খ্যাতনামা অধ্যাপক-দার্শনিক অ্যাডাম স্যাফ-এর লেখা বই—*A Philosophy of Man*। প্রতিপাদ্য—মার্কসবাদ মানুষের দর্শন। বইটির দুটি উপজীব্য। [পোলানডে তখন] বহুলপ্রচারিত সার্ত্রে-দর্শনের খণ্ডন, আর মোটামুটি "মানুষের দর্শন" হিসাবে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস [দ্রষ্টব্য: *A Philosophy of Man*: Adam Schaff, Lawrence & Wishart: London: 1963]

এরকম পটপরিবর্তনই তো আমার কাম্য ছিল। সেই একঘেয়ে, সূত্রবদ্ধ "ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম", সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। সেই স্থূল মতান্ধতার যুগের হয়তো অবসান হচ্ছে ভেবে তখন মনে নতুন আশার সঞ্চার হল। এমন সময় হাতে এল মার্কসের *Economic & Philosophic Manuscripts—1844*। স্তালিনের মৃত্যুর অনেক বছর পরে বইটি মস্কো থেকে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। বইটিতে পেলাম তরুণ মার্কসের দর্শন-প্রতীতি, খুঁজে পেলাম মার্কসবাদের সঙ্গে মানবতার যোগসূত্র। শুনলাম, আত্মবোধসম্পন্ন মানুষের কথা (he is only a self-conscious being)—শুনলাম স্রষ্টা মানুষের সৃজনশীল, স্বাধীন ক্রিয়াশীলতার কথা (his activity is free activity), শুনলাম আত্মচ্যুতির (alination) কথা। [দ্রষ্টব্য পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশ।] শুনলাম যে মানুষ মৌমাছি নয়, মৌমাছিতন্ত্রের নামও সমাজতন্ত্র নয়। শুনলাম একথা যে, মানুষ শুধুই প্রয়োজনের সীমায়, সসীমের বাঁধনে আবদ্ধ থাকে না। মানুষের ধর্মই হল প্রয়োজনাতীতকে, অসীমকে খুঁজে বেড়ানো। তখন মনে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথকে।

১৯৭১ সালে হাতে এল অ্যাডাম স্যাফের *Marxism of the Human Individual* [Mcgraw Hill Book Co., 1970)। প্রথাসিদ্ধ বিচারলেশহীন মার্কস-চর্চার জায়গায় অধ্যাপক স্যাফ মার্কসকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়াস পেলেন এই বইয়ে। যুক্তির পথ বেয়ে, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখালেন মার্কসের "মার্কসবাদ" ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশের এক অনন্য মানবিকতাবাদী দর্শন।

কোথায় গেল প্রত্যয়ের দাসত্ব? কোথায় গেল তথাকথিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূর্যামি, কোথায় গেল স্তালিনি জমানায় প্রচারিত সব তোতা-কাহিনী। আমার চৈতন্যের বিপুল বিস্তার ঘটে গেল এইসব পুস্তক পড়ে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের পরদা তো ক্রমশ উঠছিল সেই ১৯৫৬ সাল থেকেই, সোভিয়েত ইউনিয়নে, পোলানডে, চেকভূমিতে, হাঙ্গেরিতে এবং অন্যত্র। সর্বত্রই একই আওয়াজ—স্বাধীনতা চাই, মানবিকতা চাই, চাই ব্যক্তিমানুষের অনন্যতার স্বীকৃতি।

তখন থেকেই আমার স্থিরবিশ্বাস জন্মেছে যে,

১॥ মানবিক মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জার্মান মার্কসবাদ ও রুশ সাম্যবাদের পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে। আবার, লেনিনের সাম্যবাদ আর স্তালিনি সাম্যবাদের পার্থক্য বুঝতে হবে।

২॥ সূত্রবদ্ধ, স্থূল, অবাস্তব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্থলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মার্কসের মানবতাবাদকে। যার অপর নাম সাম্যবাদ। চর্চা করতে হবে মার্কসের অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্বের। বুঝতে হবে মার্কসীয় সাম্যবাদ অ্যালিয়েনেশন-মুক্ত সমাজের প্রবুদ্ধ মানুষের দর্শন।

দুই

কথাটা আগেই তুলেছি। মার্কসবাদ "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" (Dialectical Materialism)—এটা কে সাব্যস্ত করল? মার্কস নিজে তো করেন নি। মার্কসবাদ তো ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের—অর্থাৎ কান্ট, ফিক্টে, হেগেলের উত্তরাধিকার বহন করে বিকশিত হয়েছে। ফরাসি দেশের বস্তুবাদের প্রভাবও মার্কসের উপর ছিল। *The Holy Family* (পবিত্র পরিবার)-তে এই বস্তুবাদ নিয়ে মার্কস আলোচনাও করেছেন। কিন্তু কুত্রাপি মার্কস তো বলেন নি 'আমি ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিস্ট'। মতান্ধতামুক্ত মার্কসবাদীরা আজকাল স্বীকার করছেন যে "ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম" শব্দগুলি শ্লেষানভের আবিষ্কার। একথা সত্য যে *What the Friends of the People Are* (1894) পুস্তকে এই শব্দগুলি লেনিন ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী কালে সোভিয়েত দেশে ও সাম্যবাদী মহলে শব্দগুলি চলে গেছে অবাধে। কথাটা আমার মনগড়া নয়। ইংল্যানডের খ্যাতনামা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী জন লুইসের (একদা C.P.G.B-র তাত্ত্বিক) *Marxism of Marx* (Lawrence & Wishart; London 1972)। একখানা উপাদেয় গ্রন্থ। লুইস সাহেবের বইয়ের ৭৬ পাতায় পাবেন ওঁর মন্তব্য—আমার জিজ্ঞাসার উত্তর।

Marx never described his philosophy as "Dialectical Materialism",—that was Plekha-

nov's term ; nor did he think of himself as a "materialist" in the "metaphysical sense" ; on the contrary he launched the severest criticism of "all previous materialisms".

The Holy Family-তে মার্কস মেটিরিয়ালিজ-কে দুভাগে ভাগ করেছেন। ইংরেজের বস্তুবাদের বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য স্বীকার করলেও তিনি ওদের নিষ্ক্রিয় প্রতিবিম্ববাদ (passive reception of sensations) বর্জন করেছিলেন। মার্কস নিজেই বলেছেন, 'আমি সঙ্গতিপূর্ণ নিসর্গবাদ মানি যার অপর নাম মানবতাবাদ' (consistent naturalism or humanism)। এই মানবতাবাদ একদিকে ভাববাদ (idealism), অন্যদিকে বস্তুবাদ (materialism) হতে একেবারেই আলাদা।

Here we see how consistent naturalism or humanism distinguishes itself, both from idealism and materialism, constituting at the same time the unifying fruits of both. We also see how only naturalism is capable of comprehending the act of world history [পাণ্ডুলিপি দ্রষ্টব্য] :

এঙ্গেলস মার্কসের এই মতবাদকে বলেছিলেন "নতুন বস্তুবাদ" (new materialism); আর মার্কস নিজে বলতেন, "আধুনিক বস্তুবাদ" (modern materialism)। মনে রাখা ভালো, "বস্তুবাদ" নাম শুনলেই মার্কস পুলকিত হতেন না। বস্তুবাদের রকমফের আছে। বুর্জোয়াদেরও "বস্তুবাদ" ছিল। একদা বিজ্ঞানের "যান্ত্রিক বস্তুবাদ" ছিল। প্রাচীনদের মানববিদ্বেষী বস্তুবাদ ছিল। ইংল্যানডের দার্শনিক জন লকের "ব্যক্তিকেন্দ্রিক" বস্তুবাদ ছিল। মার্কস বলছেন, বস্তুবাদ যদি মানুষের সৃষ্টিশীলতার আধার না হয়, চৈতন্যের স্বকীয়তা ও সৃষ্টিধর্ম না স্বীকার করে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও কল্পনাকে ব্যাখ্যা করতে না পারে, তবে সেই গোমড়ামুখো, অবসাদগ্রস্ত বস্তুবাদ সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

আর ডায়ালেকটিস? দীর্ঘকাল ধরে আমাদের শোনানো হয়েছে হেগেলের যে ডায়ালেকটিকসকে মার্কস উলটে দিলেন তার অন্তরঙ্গ বিষয় হল : থীসিস, অ্যানটি-থীসিস আর সিনথেসিস (thesis, antithesis, synthesis)। এই ত্রিভঙ্গলয়ের ছক মেনে জগৎ-সংসার নাকি চলে, সমাজে রূপান্তর আসে, ইতিহাসের ধারা বয়ে চলে। আমরা যৌবনে স্তালিন-কথিত মার্কসবাদী ডায়ালেকটিকসের তিনসূত্র মুখস্থ করে ভেবেছিলাম, এখন আমাদের হাতে এমন চাবিকাঠি এসেছে যার সাহায্যে জগৎ-সংসার-ব্যাপারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাবে। বিখ্যাত সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক কাপিতজা ১৯৬২ সালের জুন মাসে রসিকতা করে বলেছিলেন —ফেলে-আসা ১৯৫৪ সালে সেসব দার্শনিক ডায়ালেকটিক-নীতি প্রয়োগ ক'রে আপেক্ষিকতা-বাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের কথা যদি আমরা শুনতাম তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আমাদের মহাকাশজয় কোনোদিনই সম্ভব হত না।

Had our scientists back in the year 1954 paid attention to the philosophers who applying the principles of dialectics were proving the unsoundness of relativity, we may safely say that our conquest of space could never have been made a reality. [*Soviet Review* ; June 1962]

গুছিয়ে এনে কথাটাকে বলা যাক। ১৯৪৪-এর পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভ করে "ক্যাপিটাল"-এর শেষ পর্যন্ত মার্কসের ডায়ালেকটিকসের উপজীব্য "মানুষ" ও "ইতিহাস"। প্রকৃতি বা নিখিল-বিশ্ব নয়। প্রকৃতির আলোচনা করেছেন মার্কস অন্য প্রসঙ্গে। এটা বোঝাতে গিয়ে যে অপাপবিদ্ধ, শুভ্র-নিরঞ্জন, নিষ্কলুষ "প্রকৃতি" মানুষের জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, উদ্দেশ্যের অভিমুখিনতায়, কর্মযোগে, মানুষের মূল্য-বোধে, "মানুষী" প্রকৃত হয়ে ওঠে [humanisation of nature]। এই মানুষ-প্রকৃতি-সমাজের আশ্রয়-আশ্রয়ী-ভাবই ইতিহাসের ধারাকে গতি দান করে। জন লুইস বলছেন :

There can be no question of a dialectic of external nature independently of man, because all the essential moments of a dialectic in that case would be absent. Material reality as we know it, is always socially mediated.

Dialectics, as far as Marx is concerned, is not a universal process at work in the stars, in outer space, in the geological origins of the earth, in chemistry, in biology. Nor is Marx ever concerned with "contradiction" in "nature". And the only sort of contradiction he is concerned with is that between the forces of production and the economic system. [*The Marxism of Marx*, J. Lewis, p 65]

আজ সনাতনপন্থী, শাস্ত্রবদ্ধ, মন্ত্রবদ্ধ মার্কসবাদকে পরিহার করে ফিরে যেতে হবে মার্কসের "মার্কসবাদে"। দেখছি—সনাতন, প্রথাবদ্ধ, অমানবিক মার্কসবাদের দুর্গ ভেঙে পড়ছে দিকে-দিকে। এখন প্রয়োজন সেই মার্কসকে নতুন করে আবিষ্কার করা যিনি রেনাসাঁস ও এনলাইটেনমেন্টের উত্তরসাধক, আধুনিকতার বাণী যাঁর কণ্ঠে—যিনি বলেন, সংশয়-সন্দেহ (doubt everything) করতে শেখো। যাঁর প্রণম্য পুরুষ (পৌরাণিক) প্রমিথিউস। এবং যাঁর সাম্য-বাদ (communism) মানবতার (humanism) সঙ্গে অভিন্ন।

উজান-যাত্রা

মতি মুখোপাধ্যায়

রোদ-চশমায় দিন, বালি জল ছিল প্রতিবেশী,
ফুল্ল স্মৃতি নিশিবুক্ষে ফোটাত কুসুম,
কী এমন অন্যায় পরাঙ্মুখ যদি বা প্রেমিকা,
কে না জানে একদিন দীর্ঘ শীত-ঘুম।

এভাবে গিয়েছে দিন, কাদামাটি পটুয়ার খেলা,
ভাসান হতে না হতে বেজেছে বোধন,
মৃত স্বপ্ন বুকে আজো, বেদির শহিদ যেন বলেছে নীরবে,
ঘুম-কাল শেষ হোক, এবার বোধন।

প্রতিপক্ষ নিজ ছায়া, জরতী কি আত্মভুক হবে,
অক্ষয় তূণের মতো কুহক নারীর,
খাণ্ডব-দাহন দিন, ঘোষণা কি হবে মেঘে-মেঘে,
বর্ষণের অনিবার্য অবস্থা জারির ?

এখন উজান-যাত্রা, ডাক দিলে প্রতিধ্বনি ফেরে,
স্মৃতি-গুহা পরিত্যক্ত শ্বাপদ-বিহীন,
মনে পড়ে যায় তাকে, সে এখন কোথায় কেমন
একাকিনী, নাকি কারো সমাধিতে লীন।

লেলিহান সনেট

খসরু পারভেজ

সভ্যতার রাজপথে লেলিহান রাত
রক্তাক্ত আনন্দ। জীবনকে পিষ্ট করে
দানবের থাবা আর ঘাতকের হাত।
পথদেহ ঢেকে যায় উলঙ্গ পাথরে।
কুৎসিত কামনার পাংশুল চাঁদ
জ্যোৎস্না ছড়ায় প্রাণহীন পৃথিবীতে।
অগ্নিজিহ্বা চেটে খায় যৌবনের স্বাদ।
লোভের অরণ্য জন্মে মনের মাটিতে।

কতকাল আর আমি পালিয়ে থাকব
কষ্টের কুলায়। ঠিকানার খোঁজে সভ্য
মানবনগরে কত আর কেঁদে যাব ?
বিবেক তুমি তো তোমারই ভবিতব্য।

দুঃখের দেশে মানুষের হোক জয়,
ঈশ্বরের মতো মানুষ একাকী নয়।

বাংলাদেশ

বিধিনিষেধ

শৌনক বর্মণ

তুমি রুক্ষমাটিতে আলোকবর্ষ
রয়েছ উৎপাটিত বৃক্ষ, বিমর্ষ।
ভাঙ না কখনো, গভীর নির্বেদহীন
কপটচারী, তুমি বড়োই সুকঠিন।

ঢাকো প্রচণ্ড গর্জন ঢেকে রাখো
থাকো কল্পবিলাপে মগ্ন থাকো!

ঘ্রাণে আয়ত শূন্যতা কেঁপে ওঠে
ছুটে বেড়ায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে।
ভীষণ রকম বেঁধেছ সংযমে
হাঁটবে কি এবার জলের নিয়মে?

ঢাকো তবুও গর্জন ঢেকে থাকো
কেন ক্লিষ্ট অন্ধকারে নিজেকে রাখ?

দরজা খোলা, এসো

গৌতম হাজরা

দরজা খোলা, এসো। দিনশেষে স্থবির মুহূর্তে;
শুধু একটি প্রণামে তোমাকে জেনে নেব
কতখানি পুড়েছ খরায়, কতখানি ভিজেছ বৃষ্টিতে।

আমি পরবাসী; দগ্ধ হয়েছে আমার মাটি
স্থবির মুহূর্ত থেকে শুনি তোমার সেই স্বর
আমাকে শোনাও গান; বিপ্লবের, যুদ্ধের এবং ঝঙ্কার।

প্রার্থনায় কেটে গেছে এই ভাঙা চৌকাট
আমি সূর্যের গান শুনি আর সোনালি স্বপ্ন দেখি।
সবুজ শস্যের উল্লাস দেখবার আগে
তুমি কাছে এসে দাঁড়াও, আমি অন্যরকম ভাসি।

এই পথে ধুলোর রঙ খসবার আগে
বৃষ্টিধারায় ভিজিয়ে আমাকে ঘ্রাণ নিতে দাও;
সূর্য উঠবে, ফুল ফুটবে এ-সবের দিন গুনতে-গুনতে
আমি ফিরে যাই ছাইরঙের মারণভস্মে
ছালছাড়ানো দগদগে শরীরে আমার!

সোনার চেয়ে আলোর দাম বেশি

পিনাকী ভাদুড়ী

রবীন্দ্রনাথ ডিটেকটিভ গল্প লিখতে পারতেন কিনা, তার পরীক্ষা হয় নি। যদিও "ডিটেকটিভ" নামেই একটি গল্প তিনি লিখেছিলেন, তবুও ডিটেকটিভ গল্প বলতে আমরা যা বুঝে থাকি বা মনে করে থাকি, এটি তার সঙ্গে মেলে না। গল্পটিতে নায়কের ডিটেকটিভ-গিরি নিয়ে লেখক আগাগোড়া মজাই করেছেন। শেষকালে অবশ্য সেই মজা নায়কের শিরে কিঞ্চিৎ অপ্রত্যাশিতভাবে করুণ হয়ে ফিরে আসে। নামটা ডিটেকটিভ হলেও গল্পটাকে সরাসরি গোয়েন্দা-গল্প বলা চলে না।

তবে গোয়েন্দা-গল্প যে রবীন্দ্রনাথ লিখলেও লিখতে পারতেন, তার অন্তত একটা কাছাকাছি প্রমাণ আছে। সে গল্পের নাম "গুপ্তধন"। গল্পটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেভাবে এগোয়, তাতে গোয়েন্দা-গল্পের বীজ আছে বলেই মনে হতে পারে। গল্পের শুরুটা এইরকম—

> অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যূষের প্রথম কাক ডাকিল।

যেভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে রহস্যের ইশারা থাকে, এবং এর ঠিক পরেই বলা হবে দেবীর আসনের নীচে রাখা বাক্স থেকে গুপ্তধনের নকশা হারিয়ে মৃত্যুঞ্জয় 'চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।' গল্পের সপ্তম পংক্তিতেই শুরু হয়ে গেল উপাখ্যান, নকশা চুরির খবরে টান-টান হয়ে উঠল কাহিনীর সম্ভাবনা। মৃত্যুঞ্জয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্য এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটল এবং মৃত্যুঞ্জয়ের অনুরোধ-উপরোধ এড়িয়ে সন্ন্যাসী একসময়ে অন্তর্ধান করলেন। দেবীপূজা, নকশা, গুপ্তধন, সন্ন্যাসী—সব মিলিয়ে রহস্য ঘনীভূত হল।

এইখানে রবীন্দ্রনাথ ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করলেন। ওই গুপ্তধনের নকশা কিভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের পিতামহ পেয়েছিলেন, কিভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের পিতামহ এবং পিতা

ওই নকশার চর্চায় বৃথা জীবন কাটিয়ে গেলেন, সে-সমস্তই একটি ছোটো পরিচ্ছেদে বিবৃত হল। সেই-সঙ্গে নকশার চেহারাটাও দেখালেন রবীন্দ্রনাথ—তুলট কাগজের লিখন। দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গোটানো। তাতে নানারকম চক্রের মধ্যে আঁকা রয়েছে নানা সাংকেতিক চিহ্ন। এমনকী, সেইসঙ্গে আছে একটি সাংকেতিক ছড়া; ছড়াটিতে রাবীন্দ্রিক মুন্সিয়ানা আছেই, কিন্তু এটি লক্ষণীয় যে, ছড়াটিতে রহস্যগল্পের আমেজ পুরোপুরি বর্তমান। ঠিক যেভাবে কোনো রহস্যগল্পের সমাধানসূত্র উপস্থিত হয়, সেইভাবেই এটিকে আনা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যাটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে—

> পায়ে ধরে সাধা
> রা নাহি দেয় রাধা
> শেষে দিল রা
> পাগোল ছাড়ো পা
> তেঁতুল-বটের কোলে
> দক্ষিণে যাও চলে
> ঈশান কোণে ঈশানী
> বলে দিলাম নিশানী—

ব্যাখ্যাটা সবাই জানেন। প্রথম চারটি পংক্তির মধ্য থেকে গ্রামের নামটা বেরিয়ে আসে—ধারাগোল। মৃত্যুঞ্জয় মহানন্দে বনের বটগাছের দিকে এগিয়ে গেল এবং সংকেতসূত্র অনুসরণ করে একটি সাংকেতিক চক্র আবিষ্কার করল।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্তধনের রহস্যকে প্রগাঢ় করে তোলার জন্য সেই সন্ন্যাসীকে অকুস্থলে হাজির করলেন—দেখা গেল, সেও ওই গুপ্তধনের সন্ধানেই ফিরছে, নকশার লোভেই সে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে পৌঁছেছিল। এও জানা গেল, ওই সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়েরই নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়। রহস্যের বৃত্ত তাহলে সম্পূর্ণ হচ্ছে। গল্পটা যেভাবে এতদূর এগিয়েছে তাতে মনে হতেই পারে যে, এবারে গুপ্তধনের অধিকার নিয়ে দুই দাবিদারের মধ্যে শেষ লড়াইটা হবে। গুপ্তধনের রহস্য, তার জন্যে বংশানুক্রমিক অনুসন্ধান, সংকেত-সমাধান প্রভৃতি মিলিয়ে এতে গোয়েন্দা-গল্পের উপাদান ছিল প্রচুর। যদিও গোয়েন্দা বলতে যা বোঝায় সেরকম কোনো রহস্যভেদী চরিত্র আসে নি, কিন্তু এ গল্পের প্রধান উপকরণ যা হয়ে থাকে—সম্পত্তির প্রাচুর্যলাভের অলৌকিক উপায় এবং তজ্জনিত ষড়যন্ত্র পাঠককে টানটান করে রাখে। সন্দেহ এবং সংশয় গল্পটির প্রাণ-বায়ু হয়ে থাকে, অন্তত এখনো পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ এনডরুজকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'critics and detectives are naturally suspicious' গল্পটিতে ওই সাসপিশন বজায় থাকে অনেকক্ষণ।

কিন্তু এইবারে গল্পটা মোড় ফিরল। যা হতে পারত একটি নিটোল গোয়েন্দা-কাহিনী, শুধুমাত্র ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা যার বিষয় হতে পারে, অথবা প্রায় খুন হয়ে যাবার সিচুয়েশন যার মধ্যে এসেছিল, এমন কাহিনী কিন্তু অন্য এক রহস্যের উন্মোচনে গল্পটিতে যোজনা করল নতুন মাত্রা। কেবল ঐশ্বর্য-লোভ, হত্যা—এইসবই গোয়েন্দা-গল্পের উপকরণ হয়ে থাকে, অন্য কোনো সম্ভাবনা সে সহজে স্বীকার করে না। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনলেন মানুষের অন্তরের অন্য এক নিবিড় বাসনার ইতিবৃত্ত রচনায়।

গুপ্তধনের জন্য ব্যাকুল মৃত্যুঞ্জয় বন্দী হল এক জটিল সুড়ঙ্গে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় তার জানা নেই। শুধু বিস্তর সোনার পুঞ্জ তাকে প্রথমে মায়ার মতো, পরে শৃঙ্খলের মতো জড়িয়ে রইল। মৃত্যুঞ্জয় এই মৃত সোনার বদলে পৃথিবীতে খোলা আকাশের তলায় সূর্যের আলোয় গোধূলির সোনার কল্পনায় আকুল হয়ে উঠল।

'পৃথিবীতে কি এখন গোধূলি আসিয়াছে। আহা সেই গোধূলির স্বর্ণ।'

'চারিদিকে···সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ গুপ্তধনের পটভূমিকায় মানুষের দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাত্রাকে অনেক মূল্যবান করে দেখিয়েছেন। যেমন—

'মুদি এতক্ষণে···বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে।···এতক্ষণে যে যার বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথিকে ঊর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে···হাতে দুটো একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।'

সঙ্গচ্যুত সাথি—কথাটা খুব দামি কথা, সোনার চেয়ে সঙ্গী বড়ো। জীবন দুরমূল্য। সোনার চেয়ে আলোর দাম বেশি, একথাটা রবীন্দ্রনাথ একটি নাটকে বলবেন। কিন্তু সেকথাটা বলার আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের আর-একটি গল্প পরীক্ষা করে দেখব। সে গল্পের নাম "স্বর্ণমৃগ।" "গুপ্তধন" লিখেছিলেন ১৩১৪ অর্থাৎ ১৯০৭ সালে। "স্বর্ণমৃগ" লিখেছেন ১২৯৯ অর্থাৎ ১৮৯২ সালে। এই গল্পটাতেও আছে গুপ্তধনের জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তবে ওইটুকুই। দুই গল্পের বুনোটে রয়েছে দুই বিপরীত চিত্রণ। "গুপ্তধন" গল্পে সোনার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত আলোর আকাঙ্ক্ষার কাছে পরাস্ত হল, আর "স্বর্ণমৃগ" গল্পে সোনার কামনা বিধ্বস্ত করে দিল মানুষকে।

"স্বর্ণমৃগ" গল্পের বৈদ্যনাথ সোনার জন্য লালায়িত ছিলেন না। তাঁর মধ্যে বরং আর্টিস্টের উদাসীনতা খেলা করত। তিনি গাছের ডাল কেটে ছড়ি বানিয়ে যে সুখ পেতেন, তা আর কিছুতে পেতেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী মোক্ষদা এসব সইতে পারতেন না। সোনা বানিয়ে দিতে পারি, এমন ঠক সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে প্রতারিত হবার পরেও মোক্ষদার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নি। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তিনি তাঁর স্বামী বৈদ্যনাথকে গুপ্তধনের সন্ধানে কাশী পাঠালেন। 'বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন।' সংসার তাঁকে আর্টিস্ট হয়ে থাকতে দিচ্ছে না। বোধহয় কাউকেই দেয় না।

এবারেও যথারীতি ব্যর্থ হলেন বৈদ্যনাথ। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সংসার ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হতে হল। আর্টিস্টের সঙ্গে সংসারের বোঝাপড়া কি হয় না তাহলে?

"স্বর্ণমৃগ" গল্পটা লেখা হয়েছিল "গুপ্তধন" লেখার প্রায় দশ বছর আগে। এই দুই গল্পে সোনার জন্য যে কামনা, তাকে দুদিক থেকে দেখালেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথমটায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলেও, দ্বিতীয় গল্পে মানুষের পরাজয় থেকে উঠে আসার অদ্বিতীয় ছবি আঁকা হল।

স্বর্ণমারীচের প্রতি কামনার এই বীভৎসতা "মণিহারা" গল্পেও আছে। সেখানে মণিমালিকা (নায়িকার নামটিও লক্ষণীয়) তার সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার নিজের অঙ্গে পরে নিয়েই পালাতে চেয়েছিল। পারে নি। সোনার লোভ তাকে এনে দিয়েছিল মৃত্যু। গল্পের শেষে মণিমালিকার আত্মা এসে তার স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল পরপারে। যে স্ত্রীলোক মাণিক্যের লোভেই জীবনধারণ করে থাকত, তাকে ভালোবেসে তার স্বামীও বেঁচে থাকতে পারে নি। গল্পটির চিত্ররূপে এই সর্বনাশা স্বর্ণাকাঙ্ক্ষাকে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে। মৃতা মণিমালিকার কঙ্কাল সেখানে পায়ে-পায়ে ফিরে এসেছিল তার শেষ গহনার বাক্সটি নেবার জন্য। যে ভালোবাসা ফুলের মালাতেই প্রস্ফুটিত হতে পারত, সোনার বাসনায় তাকে আত্মাহুতি দিতে হল। 'তোমার কাছে দেখাইনে মুখ মণিমালার লাজে।'

সেই সোনার মোটিফ রবীন্দ্রনাথের নাটকেও এসেছে। সোনার লোভ কেমন করে মানুষের আনন্দকে শুষে নেয়, সেকথা বলেছেন তাঁর "রক্তকরবী" নাটকে।

তারও আগে "শারদোৎসব" নাটকে লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম নিয়ে ব্যবসা করতে চেয়েছিল মহাজন লক্ষেশ্বর। তাকে ওই ব্যবসায়ে দীক্ষা দিয়েছিল ঠাকুর্দা—রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় চরিত্র, বারে-বারে

নানা নাটকে সে ফিরে-ফিরে এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে —লক্ষেশ্বরের লক্ষ্য আর ঠাকুর্দার লক্ষ্মী এক নন। সোনার পদ্মে লক্ষেশ্বর চেয়েছিল ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, ঠাকুর্দা দেখেছিলেন সৌন্দর্যের মাধুর্য। লক্ষেশ্বর যেখানে লোভী, ঠাকুর্দা সেখানে বিরাগী। একজনের আসক্তি সঞ্চয়ে, অন্যজনের শক্তি অপচয়ে। নাটকের শেষে শারদলক্ষ্মীর যে আবাহনগান শোনা যায়, তাতেও বেজে ওঠে সোনার নূপুর, তবে তার ধ্বনি বাজে হৃদয়েই। মানুষের সব ভাবনাই সোনা হয়ে ওঠে। পার্থিব সোনার বদলে মূল্যবান হয়ে যায় আমাদের মনের সম্পদ।

'কোথায় সোনার নূপুর বাজে / বুঝি আমার হিয়ার মাঝে' অথবা 'সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা'—এই দুই পংক্তি শুনলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ সোনার বাসনাকে কোন্ স্তরে উত্তীর্ণ করাতে চাইছেন।

"রক্তকরবী" অবশ্য এদিক থেকে স্বর্ণধ্বনির লোভ এবং বঞ্চনাকে সরাসরি প্রকাশ করে। এক তালের পরে দুতাল, দুতালের পরে তিনতাল—লোভের নেশা ছাপিয়ে গিয়েছে সমস্ত প্রয়োজনকে। নষ্ট হয়েছে আনন্দ। এ নাটকে রাজার ঐশ্বর্যের দম্ভের উত্তরে নন্দিনীকে তাই বলতে হয়—'সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের থেত।' যুগে যুগে পৃথিবীতে মানুষকে স্বর্ণমারীচের পশ্চাদ্ধাবন করতে দেখেছি আমরা। সেই অগণিত গোল্ড রাশ মানুষকে কখনোই সুখী করে নি, তবু পিপাসার নিবৃত্তি হয় না।

মানুষের ক্ষুধার অন্ন মাঠে কেমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয়, সেকথা রবীন্দ্রনাথ নাটকে বলেছেন—'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে', এই গানটিতে। বলছেন—'মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।' এই খুশি হওয়ার পাশাপাশি সোনার জন্য উন্মত্ততাকে কালো করে দেখাচ্ছে নন্দিনী—'অবাক হয়ে দেখছি সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে।'

সোনা, তাকে বলছেন অন্ধকার; ধানকে বলছেন বাঁশি। "রক্তকরবী" নাটক এই গানের সুরেই শেষ হয়—মাটির উপরের সৌন্দর্য মাটির নীচের ঐশ্বর্যের লোভকে হারিয়ে দিয়ে জিতে যায়। "গুপ্তধন" গল্পেও অনুরূপ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে—'ধরণীর উপরিতলে ···সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল।'

"স্বর্ণমৃগ" নিয়ে রবীন্দ্রনাথ "শেষরক্ষা" নাটকে ঠাট্টাও করেছেন, সেইসঙ্গে রসিকতার সুরে বলে নিয়েছেন হৃদয়ের সোনার কথা, বাসনার কথা। এখানেও সোনা একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট অমূল্য সৌন্দর্যের সন্ধান দিচ্ছে, সোনার বস্তুমূল্য এখানে প্রার্থিত নয়। কবিতায় লেখা এই সংলাপ শুনলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে—

—ও ভোলা মন, বল দেখি ভাই, কোন্ সোনা তোর সোনা।/—কেনাবেচার দেনালেনায় যায় না তারে গোনা।/ —ও ভোলা মন, বল্ সে সোনা কেমন করে গলে।/—গলে বুকের দুখের তাপে, গলে চোখের জলে। ইত্যাদি।

"কথা ও কাহিনী"র তিনটি কবিতা এখানে উল্লেখ করি—"দীনদান", "নিষ্ফল উপহার" এবং "স্পর্শমণি"। এই তিনটিরই বিষয় এক। সোনা বা ঐশ্বর্য নামক বস্তুটি দুরমূল্য হলেও তা যে মূল্যহীন, জীবনযাপনে তার নিষ্ফলতা যে প্রকট, এই তিনটি কবিতায় সেই কথাই বলা হয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন ভঙ্গিতে। কোথাও ভঙ্গিটি উদাসীন, কোথাও বা কিঞ্চিৎ ক্রোধে কম্পান্বিত, কোথাও বা প্রশান্ত কণ্ঠ। তিনভাবে সোনার মূল্যকে অস্বীকার করা হয়েছে, পাশাপাশি তিনটিকে পড়লে মনে হবে যেন একই কথাকে রবীন্দ্রনাথ তিনরকম উপায়ে বলে পাঠকের কাছে গ্রাহ্য করে নিতে চাইছেন। তিনটি কবিতা আসলে তিনটি গল্প। সাদামাটা ভাষায় তিনটিকেই বলা যেত, কারণ

কাহিনীর ঘটনা এবং সংলাপ নিয়েই কবিতাগুলি গড়ে উঠেছে। গল্প হিসেবে বললে এদের আবেদন যা হতে পারত, কবিতায় বলার ফলে তা অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই, যেহেতু স্টোরি এলিমেনটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছন্দ এবং মিলের অভিঘাত। তিনটি কবিতার প্রকরণও এক নয়। "স্পর্শমণি" কবিতার পংক্তিতে-পংক্তিতে যেমন মিল আছে, তেমনি একই পংক্তির ভিতরেও আলাদা করে আর-একটি মিল দেওয়ার ফলে কবিতাটি বিশেষ সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে। পর-পর মিলের ধাক্কায় দুলে ওঠে কবিতাটি, সেই সঙ্গে সজোরে আঘাত করে পাঠক বা শ্রোতাকে। কবিতাটি তাই আবৃত্তির পক্ষে উপযোগী।

"নিষ্ফল উপহার" কবিতাটির চার-চার পংক্তির স্তবকে ভাগ করা। এক-একটি স্তবকে কাহিনীর এক-একটি পর্যায়। শিষ্য তার গুরুকে দুটি স্বর্ণবলয় উপহার দেয়, গুরু উদাসীনভাবে সে দুটি পাশে রেখে পুঁথি-পাঠে মনোনিবেশ করেন। একটি বলয় অসাবধানে পড়ে যায় নদীতে। শিষ্য জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণপণে খুঁজেও সেটি উদ্ধার করতে না পেরে ভগ্নমনোরথ হয়ে উঠে আসে। শেষ চেষ্টা করার জন্য আরেকবার গুরুর কাছে জানতে চায় ঠিক কোন্‌খানে পড়েছে বলয়টি। গুরু দ্বিতীয় বলয়টিও জলে ফেলে দিয়ে বলেন—'আছে ওই নদীতলে।'

"স্পর্শমণি" কবিতার সুরটি ভিন্ন সুরে বাঁধা হলেও মূলত এর সঙ্গে "নিষ্ফল উপহারে"র মিল যথেষ্ট। "স্পর্শমণি" নামে যে সোনা-তৈরির পাথরটি সনাতন পেয়েছিলেন, সেটি তিনি ব্যবহার করেন নি, ফেলে রেখেছিলেন। জীবন নামে এক দরিদ্র মানুষ এসে যখন তাঁর কাছে ধনলাভের উপায় জানতে চেয়েছে, তখন তিনি তাকে ঐ মণিটির সন্ধান দিয়েছেন। সেই মণি ছুঁইয়ে যখন লোহাকে সোনা করেছে জীবন, তখন তার হৃদয়কেও ছুঁয়ে গিয়েছে অন্য এক মণি। ওই স্পর্শমণিটি সে নদীতে ফেলে দিয়ে হৃদয়ের সেই ঐশ্বর্যকেই চাইবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। দুটি কবিতাতেই শেষ পর্যন্ত সোনার স্থান হয়েছে নদীর অতলে। সোনার চেয়ে বড়ো কোনো প্রাপ্তিতে আর সোনার তোয়াক্কা রাখা হয় নি। জীবন নামটি কি মানুষের জীবনের প্রতীক?

"দীনদান" কবিতাটি এই দুটির চেয়ে একটু আলাদা। কবিতাটা একটানা লেখা, পঞ্চাশটি পংক্তির কোথাও যেন ছেদ পড়ছে না। এখানে সোনার দেউলকে অস্বীকার করে সাধুজী প্রকৃতির মধ্যে দেবতাকে খুঁজেছেন, সোজাসুজি রাজার দস্তকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঘটনা এবং সংলাপ এই কবিতায় একই নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হয়।

এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১২৯৫, ১৩০৬ এবং ১৩০৭ সালে। ১২৯৯ সালে লেখা "পরশপাথর" কবিতার ধরনটি একটু স্বতন্ত্র। এতেও রয়েছে একটি কাহিনী। একটি মানুষের একলা এক কামনার পিছনে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার কাহিনী। পরশ-পাথরের খোঁজে একটি মানুষ পাগলের মতো সারাটা জীবন ঘুরে বেড়াল। কখন যে সে পরশপাথর পেয়ে আবার হারিয়েছে, তা সে নিজেও টের পায় নি। যখন টের পেল, তখন দেরি হয়ে গেছে, আবার ক্লান্ত পায়ে সেই পাথর খুঁজে পাবার জন্য বাকি জীবনটা ব্যয় করতে বেরিয়ে পড়ল। এ কবিতায় পরশপাথর এসেছে মরীচিকা এবং ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে। এরই অলীক সম্ভাবনার সন্ধানে বেরিয়ে লৌকিক জীবন কেমন বিনষ্ট হয়, সোনার অলৌকিক সন্ধান কেমন মিথ্যা করে দেয় জীবনধারণ—কবিতাটি পড়লে সেকথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি বাসনার দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং অবশেষে একটি সুবিপুল রিক্ততা। কাহিনীটি অত্যন্ত ট্র্যাজিক, যেসব উপমা রূপকার্থে আনা হয়েছে, তাদের মধ্যেও ব্যর্থতার কথা, চাওয়া এবং না-পাওয়ার বেদনা। কবিতাটি শুরু হয় একজনের উন্মত্ত স্বর্ণাকাঙ্ক্ষায়, শেষ হয় পেয়ে হারানোর বেদনায়। শুধু হারানো নয়, মনে হয় যেন ঠকে

গিয়েছি। জীবনে যা হারালাম, আবার তাকে পাবার আপাত-অসম্ভব প্রয়াসে রত হওয়ার মুহূর্তে কবিতাটি শেষ হয়। এখানেও "গুপ্তধন" গল্পের মতো আসল সোনার সঙ্গে, প্রকৃতিতে যে সোনার রঙ ধরে তার একটা তুলনামূলক ছবি ফুটে ওঠে—

আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিমদিঘধূ দেখে সোনার স্বপন।

কবিতাটি যেখানে শেষ হয়, সেখানে চূড়ান্ত হতাশা।

কেবল অভ্যাসমত হুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন্ করে ঠেকাইত শিকলের 'পর।
চেয়ে দেখিত না হুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।

সারাজীবন পরশপাথর যে খুঁজেছে, কখন যে সেই পরশপাথর তার হাতে ক্ষণেকের জন্য এসেছিল তা সে বুঝতে পারে নি। তাই কবিতার শেষে, হয়তো বা জীবনেরও শেষযামে—

বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর।

এ ছাড়া আর তো কিছু করার নেই তার। সোনা তার জীবনের অর্ধেক নিয়েছে, এবারে বাকি অর্ধেকও নেবে।

রবীন্দ্রনাথের এই-সমস্ত রচনাতে সোনার মোটিফ এসেছে লোভের চেহারা নিয়ে, শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে পড়েছে পরাভূতের যন্ত্রণায়। অথবা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে জীবনের আলোয়। "নটীর পূজা" নাটকে লোকেশ্বরী যখন হাহাকার করছেন—কারণ তাঁর পুত্র সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুর বেশ পরেছে—তখন তাঁকে শান্ত কণ্ঠে ভিক্ষুণী বলছে—'সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয়, মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?"

আবার সেই সোনার তুলনা, আবার সেই আলোর জয়ধ্বনি। ভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হলেও, "গুপ্তধন" গল্পে সোনার গর্ভে দাঁড়িয়ে আলোর জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের পিপাসার কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয় নামটিও কেবল কাকতালীয় বলে আর মনে হয় না। এইসঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'আলো আমার আলো' গানটি—

মেঘে মেঘে সোনা
ও ভাই যায় না মানিক গোনা—
পাতায় পাতায় হাসি
ও ভাই পুলক রাশি রাশি

এই সোনাও আসলে আলোই, তারই পুলককে মানুষের মৃত্যুঞ্জয় অমৃতসুধাপানের আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ : রেখা ও লেখায় আধুনিকতার দ্বন্দ্ব

সমীর ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের চিত্রনির্মাণের উৎস সন্ধানে এ পর্যন্ত নানা তথ্যে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। শৈশবের ভালোবাসা, খেলার ছলে ছবির প্রতি নিবিড় অনুরাগ যা বয়সোচিত ধর্মের সঙ্গেই যুক্ত, সেসব পথ পেরিয়ে হঠাৎ একদিন পরিণত মনস্কতায় নতুন করে ছবির প্রেমে কবি ধরা পড়লেন। এই নতুন করে ছবির প্রতি আসক্তি কিংবা রেখার মায়াজাল রচনারও একটা ইতিহাস আছে। সে ঘটনাক্রমের কথা ইতিমধ্যে আমরা অনেকেই জেনেছি।

পেরু রাজ্যের শতবার্ষিকী উৎসবে যুক্ত হবার আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯২৪ সালের ১৯ সেপটেম্বর কবি দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেন। কবির সঙ্গী ছিলেন এল্‌ম্‌হার্স্ট। হঠাৎ পথে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কবির পেরুযাত্রা স্থগিত হয়। সে সময় আর্জেনটিনার রাজধানী বুয়েন্‌স্ আয়ার্স্ শহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে সান্ ইসিদ্রোর গ্রামে সুদৃশ্য এক বাগানবাড়িতে শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অতিথি হয়ে কবি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এখানে তিনি ছিলেন ৩০শে ডিসেমবর পর্যন্ত। এই দীর্ঘ যাত্রাপথেই শুরু হয় তাঁর "পূরবী" কাব্যগ্রন্থের কবিতা রচনার পালা। সান্ ইসিদ্রোর স্বপ্নময় পরিবেশে বিশ্রামের ফাঁকে-ফাঁকে কবি কাগজের পাতা ভরিয়ে তোলেন কবিতায়। আর এখানেই শুরু হয় তাঁর সচেতন এক খেলা। রেখার কাটাকুটিতে অনর্গল ছন্দের মায়াজাল। প্রথমাবস্থায় নিছক ত্রুটিশোধনের তাগিদেই কাটাকুটি শুরু করেছিলেন, যা সান ইসিদ্রোর পূর্বেও তিনি করেছেন। পরিশীলিত মননে এই সামান্য সংশোধনের কাজেও কোনো শৈথিল্য দেখান নি। কিন্তু "পূরবী" পাণ্ডুলিপির রেখাজাল নির্মাণে তিনি প্রয়োজনের বাইরে এক অনাগত রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিশ্চয়ই। আর সেই রূপের দুর্নিবার আকর্ষণে পাণ্ডুলিপির সংশোধনকে নকশার ছাঁদে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সচেতনভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মুখ থেকে শোনা সে

অভিজ্ঞতাও কম রোমাঞ্চের নয়,—'ওঁর একটি ছোটো খাতা টেবিলে পড়ে থাকত, ওরই মধ্যে কবিতা লিখতেন বাঙলায়। বাঙলা বলেই যখন তখন খাতাটা খুলে দেখা আমার পক্ষে তেমন দোষের ছিল না। এই খাতা আমায় বিস্মিত করল, মুগ্ধ করল। লেখার নানা কাটাকুটিকে একত্র জুড়ে দিয়ে তার ওপর কলমের আঁচড় কাটতে যেন মজা পেতেন কবি। এই আঁকিবুঁকি থেকে বেরিয়ে আসত সব রকমের মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানা আবোলতাবোল। সমস্ত ভুল, সমস্ত বাতিল-করা লাইন, কবিতা থেকে বহিষ্কৃত সব শব্দ এমনি করে পুনর্জীবিত হত এক রূপের জগতে, আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন স্নিগ্ধ-কৌতুকে হাসত তারা, নয়তো তাকিয়ে থাকত একটু বাঁকা মুখে, মেলে ধরত যেন কোনো অজানা প্রাণীর ভয়ংকর দৃষ্টি। কাকুতি করে বললাম, এর কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি তুলতে দিতে হবে আমায়। আমাকে খুশি করবার জন্যে উনি রাজিও হলেন। এই ছোটো খাতাটিই হল শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্ব। কবিতার মধ্যে শব্দযোজা ব্যাপারটাকে রেখায় রূপান্তর দেওয়া থেকেই এই শিল্পের জন্ম হয়।'

"পুরবী" পর্বের চিত্রনির্মাণের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার সূচনাপর্ব নয়। এর বহু আগেই নানা বয়সে চিত্রচর্চার বিবিধ প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ যুক্ত থেকেছেন। তাঁর বিভিন্ন রচনাংশে চিত্রচর্চার কথা-কাহিনী আমরা জানতে পারি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের "সর্ব প্রথমোদ্যম" চিত্রের সন্ধানও আমরা জেনেছি। ১৮৮০ সালে অর্থাৎ উনিশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির সংগ্রহ বর্তমানে ইন্দ্রকিশোর কেজরিওয়ালের কাছে আছে। তবে এসব ছবিতে 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা'র বৈশিষ্ট্যগুলি অনুপস্থিত। বরং এই প্রতিকৃতিগুলি মূলত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট রীতির অনুসারী মনে হয়। তবু তথ্যের মূল্যে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আমাদের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রচিত্রকলার গুণ-বিচার নয়। সাহিত্যনিরপেক্ষ চিত্রনির্মাণের উৎস অনুসন্ধান এবং পাশাপাশি ছবির আধুনিকতার সঙ্গে সাহিত্যের আধুনিকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দ্বন্দ্বের কারণ অন্বেষণ।

ভারতীয় চিত্রকলার নব্যনির্মাণভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় চিত্রকলার নব্যনির্মাণভাবনায় হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীরা যে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যুক্ততাও সবিশেষ উল্লেখ্য। হাতে-কলমে শিল্পশিক্ষার ধারাবাহিক চর্চা না করলেও, ভারতীয় নব্যচিত্রের ভাষারীতির বিরুদ্ধে সে সময়ে যে প্রবল জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল, তা প্রতিহত করতে কবি কলম ধরেছিলেন। ভারতীয় শিল্পে পাশ্চাত্যের যুক্তিহীন প্রভাব বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। আর সেই কারণেই অর্থহীন অনুকরণে ব্রিটিশ শিল্পরীতির ছায়াবৃত্তে বন্দী হওয়াকে তিনি নিন্দা করেছেন। বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য শিল্পের গুণকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু স্বদেশীয় শিল্পের গুণমানবিষয়ে দেশীয় শিল্পীদের সচেতন করতে তিনি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এ অবশ্য ভারতীয় নব্যশিল্পের জন্মলগ্নের ভাবনা। কিন্তু যখন অবনীন্দ্রনাথের সুযোগ্য নেতৃত্বে একদা ছাত্রশিল্পী ভারতশিল্পের আত্মার অনুসন্ধানে কর্মপ্রেরণায় ব্রতী হন, এবং এঁদের বেশ কয়েকজনের মধ্যে সুপ্ত ছিল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ—রবীন্দ্রনাথ এই আগামী প্রজন্মের শিল্পী-দলকে নতুন পথে সমৃদ্ধির পূর্ণতায় নিয়োজিত করতে চাইলেন। ব্রিটিশ শিল্পরীতির ছায়ামুক্ত হয়ে, দেশজ ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের মধ্যে শিল্পের যে উত্তরণের স্বপ্ন একদিন প্রকাশ পেয়েছিল, তা ক্রমে-ক্রমে ঐতিহ্যের সংকীর্ণতায় গণ্ডিবদ্ধ হতে শুরু করল। একদিকে পাশ্চাত্য তথা ব্রিটিশ শিল্পশৈলীর দুরপ্রসারী প্রভাব, অন্যদিকে ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের প্রতি যুক্তিহীন অন্ধ অনুরাগ, ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীকে দুটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভাজিত

বিচিত্রা ভবনে দুদিনের আলোচনাসভায় বাদপ্রতিবাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—'আমরা একদিন যা ভেবে এসেছি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ উলটো রকমের ব্যাপার হবে, এই রকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন।'

১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে দিল্লির প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে অমল হোম প্রবন্ধ পড়েন। "অতি আধুনিক" অভিধায় এই প্রথম তরুণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এক বড়ো আয়োজন। প্রবন্ধের বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি তীব্র ধিক্কার ঘোষিত হয়। সাহিত্যে আধুনিকতার প্রশ্নে উত্তাল হয়ে ওঠে বাঙলা সাহিত্য-অঙ্গন। অমল হোমকে লিখিত এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানান, 'তোমার উত্তেজনা অস্বাভাবিক না হতে পারে—কিন্তু তার উত্তাপ আমাকে দেবার চেষ্টা কেন। সাহিত্যনীতি নিয়ে যে কোলাহল তুমি দিল্লিতে শুরু করেছিলে তা বেড়েই চলেছে। তাতে কান দিতে গেলে যে বাণী অন্তর থেকে শুনতে পাই সে আর শোনা হয় না। কী হবে এসব ক্ষণজীবী বাক্য-পতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনিতে মনকে বিক্ষিপ্ত করে?'

তরুণতর সাহিত্যিকদের সাহিত্যের ভাষা ও ভাবনার আধুনিকতাকে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণজীবী বাক্য-পতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি' বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমসময়েই তিনি চিত্ররচনার ভাষাব্যবহারে প্রচলধারাবিরোধী বিধ্বংসী আধুনিকতায় উন্মুখ। সাহিত্য ও চিত্র রচনার দুই ধারায় তাঁর ভিন্ন মানসিকতার ছায়াপাত আমাদের বিহ্বল করলেও, সর্বতোভাবে ভাবনার এই বৈপরীত্য অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে হয়।

সাহিত্যের বিষয়ভাবনা ও নির্মাণকৌশলে রবীন্দ্রনাথ পূর্বার্জিত ধারণার সংস্কারকে কোনো দিনই সম্পূর্ণত দূর করতে পারেন নি। সময়ের পরিবর্তনে

বিন্যাসের আধুনিক ধারা সম্পর্কে অনেকেই সচেতন ছিলেন না। দেশের মাটিতে চিত্রভাবনার নিস্পৃহ স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথকে আহত করেছে। ফলে দেশের গ্রহণ অপেক্ষা বিদেশের যাচাই-বুদ্ধির ওপর কবি বহুলাংশে নির্ভর করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একবার কথাপ্রসঙ্গে হেমন্তবালাকে জানান, 'সাহিত্যে একটা খ্যাতি পেয়েছি তার কাছে আমার দায় আছে, সে দায় বাঁচিয়ে চলতে হয়—কিন্তু যদি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একটা ছবি আঁকতে থাকি—তাহলে যা তা আঁকতে দ্বিধা করিনে।' এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমসময়ের চিন্তাচেতনার স্পর্শ পাই। সাহিত্যের যে দায় তাকে কবি খ্যাতির দায় বলে ভাবছেন। আর এই দায়কে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তিনি সদা তৎপর। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কবি শুধু কি খ্যাতির তাড়নাতেই এতটা উদ্গ্রীব! অন্য কোনো চেতনাও কি তাঁকে আক্রান্ত করে নি? খ্যাতি বা স্বীকৃতি অবশ্যই প্রচণ্ড এক চাপ সৃষ্টি করেছে কবির মনের ওপর। এরই পাশে-পাশে সাহিত্যের সঙ্গে কবির দীর্ঘ সময়ের যোগাযোগ অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং সৃজনের নানাবিধ সংস্কার—তাও তো কবিকে ভিন্নতর দায়ে বদ্ধ করেছে। যে চেতনাপ্রবাহ থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চাইলেও সহজে মুক্তি মেলে না।

আধুনিকতা : সাহিত্যে আর চিত্রে

১৯২৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত "প্রগতি" পত্রিকার তরুণ সাহিত্যিকেরা ঘোষণা করেন : রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই। সমসময়ে "কল্লোল"-"কালিকলম" পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিমুখতার ছায়াপাত ঘটেছিল। রবীন্দ্রানুসারী ভক্তজনের কেউ-কেউ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। এমনকী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিকতার সোচ্চার বিরোধিতায় লিখলেন "সাহিত্যধর্ম" এবং "সাহিত্যে নবত্ব"। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে

করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই দুই ভয়াবহ সংকীর্ণতাকে দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন। সেই কারণেই একদিন ভারতশিল্পপ্রেমী হ্যাভেল সাহেবের পাশ্চাত্য শিল্প-শিক্ষাবিরোধিতাকে যেমন যুক্তিগ্রাহ্য রচনায় স্বাগত জানিয়েছিলেন, পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখের শিল্পভাবনার গণ্ডিবদ্ধতার বিরুদ্ধেও তেমন সচেতন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। ঘরের সীমা থেকে বাইরের আঙিনায় অভিজ্ঞতার আলোক-ঝরনায় অবগাহনের আহ্বান জানিয়েছেন। শিল্পের বিবর্তিত আবহে কবির সচেতন ভূমিকা ভারতশিল্পের গতিপথনির্ণয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষাপ্রবর্তন, কলাভবনের প্রতিষ্ঠা, নন্দলালের সুযোগ্য নেতৃত্বে কলাভবনে সৃষ্টির জোয়ার—এ-সবের মূলেও আছে কবির ভারতশিল্পের গতিপথনির্মাণে, চরিত্রস্থাপনের এক অদম্য দায়বোধ। চিত্রশিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা বিলাসী নন্দনবোধের প্রকাশমাত্র নয়, বরং চিত্রনির্মাণের নিজস্ব ভাষা-রীতির আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলকে দেশজ ভাবনার অঙ্গীভূত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই চিত্রনির্মাণের শিক্ষার পাশে-পাশে দেশবিদেশের শিল্পের ইতিহাস আর সমকালীন আন্দোলন-ভাবনার রূপরেখাকেও তিনি শিক্ষায় যুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। নব্য-ভারতীয় শিল্পের অর্থাৎ "বেঙ্গল স্কুল" নামে পরিচিত চিত্রের স্থবিরতা, বিষয়ে পুরাণপ্রতিমার মাত্রাধিক উপস্থিতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগ—এসবের হাত থেকে ছবিকে মুক্ত করতে তিনি ছবির গড়নে বলিষ্ঠতা, রঙের উজ্জ্বলতা এবং বিষয়ের ব্যাপ্তির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নন্দলালের শান্তিনিকেতনপর্বের ছবিতে যে রূপান্তর ঘটে, তার জন্য শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির মুক্ত আবহ যেমন প্রেরণা যুগিয়েছে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনন্দন-চেতনার প্রভাবও উজ্জ্বল।

ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বিভিন্ন পর্বে, বিবিধ রূপান্তর কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। বরং, ভাবনার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমসময়ের বিশিষ্ট চরিত্রই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির এই রূপান্তরিত ভাবনার মূলে কাজ করেছে এক শাশ্বতগতি যা কোনো সীমাবদ্ধতা, সংস্কারের বাধায় বন্দী নয়। চিত্রচিন্তায় আধুনিকতাকে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য মনে গ্রহণ করতে সবিশেষ আগ্রহী। আর এখানেই তাঁর সাহিত্যের আধুনিকতার সঙ্গে চিত্র-নির্মাণের আধুনিকতার দ্বন্দ্ব সোচ্চার হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ভাষা এবং ছবির ভাষার মূলগত ব্যবধান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। সাহিত্যের সংস্কার এবং অধিকারবোধ যেমন তীব্র-ভাবে তাঁকে আক্রান্ত করেছিল, ছবি সে তুলনায় তাঁর কাছে ছিল অনেক বেশি স্বাধীন শিল্পমাধ্যম। নতুন এক শিল্পমাধ্যমের প্রতি পরিণত বয়সে কবির আকৃষ্ট হবার কারণ মূলত দুটি,—একদিকে ভারত-শিল্পের শরীরনির্মাণে নতুনবোধসঞ্চারের দায়, এবং তদ্গত ভাবনার প্রেক্ষায় ছবির গঠনপ্রক্রিয়ার অনু-সন্ধান। এই অনুসন্ধানের রোমাঞ্চকর আবহে তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নতুন প্রাণরসে আবর্তিত হন। নিজের ছবির বিষয়ে কবির যে দ্বিধা তা প্রধানত চিত্রের গুণ সম্পর্কিত ভাবনায় নয়, বরং সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বাস বা সংস্কারবোধ এক্ষেত্রে তাঁর সংকোচের অন্যতম কারণ। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে কবিখ্যাতিতে আসীন। কবির চিত্ররচনাকে যদি কেউ খেয়ালির খেলা বলে উপহাস করে, চিত্রের গুণ-অনুল্লেখে শুধুই স্তোকবাক্যে ভোলাতে চায়, এমন আশঙ্কা তিনি করেছিলেন। অবশ্য এই ভাবনাকে কেউ-কেউ দীর্ঘদিন প্রশ্রয়ও দিয়েছেন। এমনকী কবির নিকটজনেরাও প্রথমে তাঁর ছবির গুণগত দিককে উপেক্ষা করে নিস্পৃহ থেকেছেন। নন্দলালের মতো শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবির গুরুত্ব সঠিক অনুধাবনে উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন ভারতশিল্পভাবনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ছবির উপস্থাপনা, গঠনগত

তাঁর সাহিত্যের বিষয়ভাবনায় ও রূপারোপে আধুনিক-বোধের ব্যাপ্তি প্রকাশ পেলেও ক্ষণে-ক্ষণে তা ঐতিহ্য-বোধের কড়া শাসনে শাসিত। এই সংস্কার অবশ্যই এক নিবিড় পিছুটান, অর্জিত বোধের প্রতি তীব্র আসক্তিকে চিহ্নিত করে। "আধুনিক" এই শব্দ-মাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন অভিধায় বারবার প্রকাশ করেছেন। আর এরূপ প্রকাশেই থাকে মনের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। আধুনিকতাকে তিনি 'ল্যাঙট-পরা গুলি পাকানো ধুলোমাখা'-য় চিহ্নিত করতে চান। কখনো ব্যঙ্গ করে বলেন, 'আমরা আধুনিক, আমরা আমিষ-লোলুপ'। এভাবেই তিনি আধুনিকতার স্বরূপকে বারবার তুলে ধরতে চান, আর এরই পাশে তাঁর ভাবনার পরিসরকে প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াসী হন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন, 'বঙ্কিম যে যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ-পর্যন্ত আমার কাজ ছিল।' বাস্তবে যদিও রবীন্দ্রনাথ কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা সময়ের সংকীর্ণ ঘেরাটোপে বন্দী হন নি, তবু এই উক্তির মধ্যে যুগের প্রতি দায়বদ্ধতার স্বীকারোক্তি স্পষ্ট। এর অন্যতম কারণ 'অতি আধুনিকতার' উচ্চাভিলাষী নিনাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লালিত বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা প্রয়াস। বিশ্বাসের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থারই অন্য নাম সংস্কার, যার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশেই চালিত ছিলেন। আর এই সংস্কারের বাধাই তাঁর মনে নতুন সাহিত্যভাবনার ধারণা গ্রহণে ও বর্জনে নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের "নবীন" নাটকের সংলাপে পাই, 'আমরা নতুন চাইনে, আমরা চাই নবীনকে'—নতুন আর নবীনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে তিনি প্রকারান্তরে আধুনিকতার স্বরূপকেই উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। 'নবযুগ একটা কথা মাঝে-মাঝে ভুলে যায়—তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত।' আর এই প্রসঙ্গেই তিনি নতুনের সমালোচনা করে বলেন, 'সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃততরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়াগলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই এমনই এক 'সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের' সোচ্চার প্রকাশ। এমনকী রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের বারবার নানাপ্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন ছবির অর্থহীন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া পরিচয়। ১৩৩৪, ফাল্গুনে "কবির অভিভাষণ" রচনায় যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধানকে তিনি উপহাসে অবজ্ঞা জানিয়েছেন, ১৯৩১ সালে "রাশিয়ার চিঠি"তে সেই সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতকেই মনে-মনে মেনে নিয়েছেন। 'মস্কো শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টি-ছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো-দেশীই নয়।'

চিত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিকতা কিংবা স্বপ্নচারিতাকে সহজ মনেই গ্রহণ করেছিলেন। রোদেনস্টাইনকে লিখিত চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'বৈধী অনুশীলনহীন আঙুল আর মনের সৃষ্টি বলেই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অবশ্যই ছবিগুলির কিছু আকর্ষণ আছে। লোকে যাকে ভারতীয় চিত্রকলা বলে এ তার প্রতিনিধি নয়। এক অর্থে এগুলি হয়তো মৌলিক।' কিংবা যখন বলেন, 'এগুলি আঙ্গিক ও শৈলীর দিক থেকে সেই দুঃসাহসিকতায় আঁকা যা একমাত্র অশিক্ষিত নাছোড়বান্দা আবেগ-প্রবণ স্বপ্নচারীর পক্ষেই সম্ভব।' চিত্রচর্চায় এই স্বপ্নময়তা ও অবচেতন মনকে স্বীকৃতি দিতে কবি যতখানি তৎপর, সাহিত্যে অবচেতনা ও স্বপ্নবিহ্বল সৃষ্টিকে স্বাগত জানাতে সামান্যও আগ্রহী নন। বরং বিদ্রূপের খোঁচায় অবচেতনাকে বারবার তিনি বিদ্ধ করেছেন। ১৩৪৬ অঙ্গানের "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় "অবচেতনার অবদান" নামে একটি কৌতুক-

কবিতা প্রকাশিত হয়। সঙ্গে একটি মুখবন্ধও ছাপা হয় : 'অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবীযুগের সাহিত্যিকের প্রতি লক্ষ করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তাহলেই আশাজনক হবে।' ভাবী যুগের নব্যভাবনার লেখকদের প্রতি এই ব্যঙ্গ মূলত বিশ্বাসের অনিবার্য দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বের একটি মূল্যবান সূত্র পাই "কবির অভিভাষণ" রচনার এক উক্তিতে : 'সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান।' বিশেষ শব্দের প্রতি এই মুগ্ধবোধের কারণ সম্ভবত ঐতিহ্যের বিশ্বাসকে কবি প্রাধান্য দিতে চান। পরবর্তী সময়ে চিত্রসাধনায় ব্রতী রবীন্দ্রনাথ চিত্রের গঠন ও বর্ণ-প্রয়োগে প্রচল রীতির অবসান ঘটিয়ে, বাহুল্যবর্জনের তাগিদে সহজ-সরল অনাড়ম্বর রূপের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। অথচ সাহিত্যে শব্দপ্রয়োগে ঐতিহ্যের অর্থভার বর্জনে তিনি শঙ্কিত দ্বিধাগ্রস্ত। শব্দের আটপৌরে ব্যবহার তাঁর কাছে শুধুই 'তাক' লাগানোর ছল বলে মনে হয়।

অভ্যাস বা বিশ্বাসের এই বাধা সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। তরুণতম কবি বুদ্ধদেব বসুকে ১৯৩৩ সালের ২৬ সেপটেম্বর লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'কল্যাণীয়েষু বুদ্ধদেব, ভালো না লাগা, ভালো বলতে না পারার মতো দুঃখ অল্পই আছে। সেই জন্যে আধুনিক বাংলার নতুন বই পড়তে আমার ভয় লাগে তার একমাত্র কারণ এ নয় যে বইটা ভালো না লাগতেও পারে। যুগবিশেষের এবং ব্যক্তিবিশেষের স্বাদগ্রহণের একটা বিশেষ অভ্যাস আছে। আমাদের যাচাই বুদ্ধির উপরে সেই অভ্যাসের প্রভাব থাকতে বাধ্য। যে নৈর্ব্যক্তিক রুচি নিজের দেশকালপাত্রগত সমস্ত সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে সেই সম্পদের কল্পতরু ক-জনের ভিত্তে আছে? সেইজন্য ভয় হয় পাছে অবিচার করি। আমাদের চির অভ্যাসের সঙ্গে যা সঙ্গত তাতেই আমাদের আরাম, এই আরামের বাধা আনন্দকেও রাহুগ্রস্ত করে, জ্যোতিষ্ককে করে ছায়াচ্ছন্ন। নূতন কালের সৃষ্টির সঙ্গে পুরাতন কালের অভ্যাসের রফা নিষ্পত্তি হোতে কিছুদিন সময় লাগে।'

চির অভ্যাসের সঙ্গে যা সঙ্গত, তেমন আরাম বা আশ্বাস সাহিত্যে পেতে চাইলেও চিত্রের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ চির অভ্যাসের আরামকে পরিহার করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। অনেক প্রাজ্ঞজনই রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে সাহিত্য এবং সাহিত্যের সঙ্গে ছবির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে আগ্রহী অথচ সাহিত্যে ও চিত্রে ভাষানির্মাণের সমান্তরাল পার্থক্যলক্ষণও অপ্রতুল নয়। বরং আধুনিকবোধে সাহিত্য যেখানে সংস্কারে সঙ্কুচিত, চিত্র সেখানে গ্রহণ বিষয়ে অনেক সোচ্চার।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা ও সাহিত্যচর্চার সুস্থির ধারাবাহিকতা সবিশেষ লক্ষণীয়। আশৈশব সাহিত্যসাধনার পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের গতিপথকে রবীন্দ্রনাথ সচেতন প্রয়াসে গড়ে তুলেছিলেন। মাত্র সাত-আট বছরে পয়ার ছন্দে পদ্য লেখার সূচনা, পর্বে-পর্বান্তরে নবনব উন্মেষে তার সফল সমাপ্তি। ধারাবাহিক এই সাধনার সামগ্রিক বোধ বা বিশ্বাসে তিনি কি যুক্ত ছিলেন না? শৈশবে পদ্য-বিষয়ক একটি কবিতায় কবি 'দ্বিরেফ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র কবিতাটি শুনে তারিফ জানালেও 'দ্বিরেফ' শব্দটির প্রতি কিঞ্চিৎ আপত্তি তোলেন। কিন্তু শৈশবে রবীন্দ্রনাথ ওই শব্দটির দুরূহতায় সবিশেষ আশান্বিত ছিলেন।

ভ্রমরের পরিবর্তে দ্বিরেফ শব্দের প্রতি ওজনের আকর্ষণেই সম্ভবত তিনি অতিমাত্রায় পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে দীর্ঘ সময়ান্তরে 'রক্ত' ও 'খুন' শব্দের তুল্যমূল্য বিচার। শৈশবের খেলা পরিণত মনস্কতায় যুক্তির ভিতে স্থিত। কিন্তু সহজ ত্রাত্য শব্দকে হয়তো সংস্কারের বাধায় কবি গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, আড়ষ্ট। শৈশব থেকে গড়ে ওঠা রুচির ঔচিত্যবোধ, পরিণতিকে সহসা চলতি হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে তিনি নারাজ। একদিকে সাহিত্যে স্বীকৃতির দায়ভার, অন্যদিকে ধারাবাহিক চর্চায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও চেতনার সংস্কারবোধের দায়— এই দুই বাধা কালাপাহাড়ি আধুনিকতার চর্চায় প্রবল প্রতিবন্ধক। তাই সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেন ধারাপথে ধারাবাহিক হতে চেয়েছেন। ধারাবিচ্ছিন্ন কোনো নতুনে নয়, প্রচল পথেই তিনি সময়কে সঙ্গী করে নবত্বের স্বাদ আনতে আগ্রহী ছিলেন। চিত্রনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। স্বতঃস্ফূর্ততায় মুক্ত, স্বাধীন।

"প্রগতি" পত্রিকায় তরুণতম কবি অজিত দত্ত রবীন্দ্রবিরোধিতার ডাক দিলেন, 'সাহিত্য যখন একজন সম্রাটের দ্বারা শাসিত হয় তখনই তার সব-চেয়ে বড়ো দুর্দিন।' কবি মোহিতলালের "বিস্মরণী" পড়েই তিনি ঘোষণা করেন, 'বাংলার কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতায় রবীন্দ্রবিরোধিতা ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ পেল, পশ্চাতে শঙ্করা শর অগণন হাম্বুক ধারালো, / সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর, / আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো / যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।'

তরুণতমদের রবীন্দ্রসাহিত্যবিরোধিতা কখনই ব্যক্তিক বিদ্বেষে পরিণত হয় নি। আর সেই কারণেই অনতিবিলম্বে এই তরুণতম কবিদলের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। তরুণদলের মুখপত্র "কবিতা", "পরিচয়" পত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের পাশে রবীন্দ্রনাথের রচনারও প্রকাশ ঘটেছে। রুচি বা বিশ্বাসের ভিন্নতা সম্পর্কে ক্ষত সৃষ্টি করে নি। ১৩৪২ আশ্বিন ত্রৈমাসিক "কবিতা" পত্রিকার প্রথম সংখ্যার রচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত চিঠি মারফত জানতে পারি। প্রতিটি কবিতা বিষয়েই কবির মন্তব্যে ফুটে ওঠে তাঁর রুচি ও পছন্দের মাত্রা। ওই সংখ্যায় জীবনানন্দের "মৃত্যুর আগে" কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' এই মন্তব্যে একটু বিস্ময় জাগে যে, রবীন্দ্রনাথের চেতনায় জীবনানন্দের কবিতা নিছকই 'চিত্ররূপময়'! "মৃত্যুর আগে" কবিতার দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা ও ব্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ কাড়তে অপরাগ হয়েছে, তা নিশ্চিত। অবশ্য "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কাব্যগ্রন্থ পাঠ করার পর তিনি মন্তব্য করেন, 'তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।' কিন্তু এ মূল্যায়নও যেন জীবনানন্দের কবিব্যক্তিত্বের পূর্ণতাকে ছুঁতে দেয় না। জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শুধু তাকিয়ে দেখার আনন্দ পেলেন, অতলে ডুব দেবার অনুভবে কবি ও কবিতাকে বুঝতে চাইলেন না। অবশ্য এর আগে "ঝরা পালক" কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 'তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রা-দোষটা ওস্তাদীকে পরিহাসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্টো।' "ঝরা পালক" থেকে "ধূসর পাণ্ডুলিপিতে" জীবনানন্দের উত্তরণ শুধুমাত্র 'চিত্ররূপময়' মন্ময়তায় যেন সীমা-বদ্ধ। সমর সেনের কবিতার অপরিচয়ের অস্পষ্টতার কারণ কবি রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন,

'...আমাদের রসসম্ভোগের অভ্যাস তোমাদের এ যুগের নয়, ক্ষুণ্ণ মনে এই কথা কবুল করে তোমাকে আশীর্বাদ জানাই।'

রবীন্দ্রনাথ 'যুগধর্মের' যুগকে মানতে চান নি, কিন্তু ধর্ম স্বীকার করেছেন। অথচ বারবার যুগ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আধুনিকতার ধারণাকে আবর্তিত করেছে। দীর্ঘ জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা রুচি ও ঐতিহ্যের টানাপোড়েনে বারবার তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি রূপান্তরিত হয়েছে। সমসময়ের অভিজ্ঞতার ভাষা মিশেছে সৃষ্টির শরীরে। তবু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংযমী। দায়িত্বপালনে নিবিষ্ট মগ্ন সন্ন্যাসী।

আধুনিকতার সংশয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিকে দীর্ণ করতে পারে নি। কবিতা পনেরো আনা লোক লেখে, গান বারো আনা লোকে গায় আর ছবি ছ আনার বেশি আঁকে না—সেই কারণবশতই বোধহয় ছবি আঁকায় কবি ছিলেন অনেক নিশ্চিত। তবু যেটুকু দ্বিধা, তা মূলত সাহিত্যের খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার সংকোচ। তবু এই সংকোচকে তিনি অনতিবিলম্বে কাটিয়ে উঠে অনর্গল আবেগে এঁকেছেন ছবি। কবি তাঁর ছবিকে বলেছেন বৈধী অনুশীলনহীন আঙুল আর মনের সৃষ্টি। এক অর্থে তা স্বীকার-যোগ্য। শৈশবের ধারাবিহীন শিল্পচর্চায় কোনো সুনির্দিষ্ট দায়বোধ বা প্রকাশপ্রতিষ্ঠার চাহিদা ছিল না, যেমন ছিল সাহিত্যচর্চার সুস্থির চিন্তায়। তবু পারিপার্শ্বিক আবহে ছিল নন্দনচেতনার যথেচ্ছ আয়োজন। এই পরিমণ্ডলেই তিনি বর্ধিত হয়েছেন। নন্দনবোধে হয়েছেন সমৃদ্ধ। নব্যভারতীয় শিল্পের প্রথমাবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। দেশ-বিদেশে ভ্রমণে চিত্রচর্চার আধুনিক ভাষাভঙ্গির পরিবর্তন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। এসবই তাঁর বৈধী অনুশীলনহীন আঙুলকে শিক্ষিত না করলেও, মনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করতে পেরে-ছিল। প্রচলপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। আর সাহিত্যের যুগধর্মের সংস্কার তাঁকে চিত্রভাবনায় প্রভাবিত করতে পারে নি বলেই সহজে স্বতঃস্ফূর্ততায় স্ববির রূপারোপ ভেঙে অন্তর ব্যঞ্জনায় ছবির সীমাকে মুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে-ছিলেন। রোদেনস্টাইনের কাছে লিখিত চিঠিতে এই মুক্তির ডাক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'আক্রমণকারীর নির্মম যথেচ্ছাচার নিয়ে আমি ভারতীয় চিত্রকলার আত্মতৃপ্ত নিশ্চলতার রাজ্যে কালাপাহাড়ি করে চলেছি আর আমার দেশবাসী আমার চিত্রকলার সম্বন্ধে কী রায় দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে হতচকিত।'

শৈশব-কৈশোর এবং যৌবন পেরিয়ে এসে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার উচ্চনাদী কলরোল উপেক্ষা করে হঠাৎ তিনি আত্মপ্রকাশে ছবিকেই অবলম্বন করলেন। অবনীন্দ্রনাথ একেই 'ভল্‌কানিক ইরাপশন' বলেছেন। 'অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতরে'—এমন প্রশ্নও অবনীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে। এই সঞ্চয়ের সন্ধানই রবীন্দ্রনাথকে চিত্রচর্চার মূল সূত্র। অনেকের মতে, সাহিত্যের অভিজ্ঞতাই শেষ বয়সের ছবিতে নতুন প্রকাশে উজ্জ্বল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সাহিত্যের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিতে অতিমাত্রায় উৎসুক। কিন্তু সাহিত্যের শরীরনির্মাণভাবনায় কবি যেখানে অতিমাত্রায় সংযমী, যুগ অপেক্ষা ধর্মকেই স্বীকৃতি জানাতে উন্মুখ, সেখানে ছবির নির্মাণে নির্মম যথেচ্ছাচার আর কালাপাহাড়ি মানসিকতাকে কিভাবে প্রশ্রয় দিলেন? আসলে, রবীন্দ্রনাথের এই সঞ্চয়ের মূলে শুধু সাহিত্যের অভিজ্ঞতা নয়, সার্বিক নন্দনবোধ যেমন কাজ করেছে, বিপরীতে ভারতীয় চিত্রকলার আত্মতৃপ্ত নিশ্চলতার বিরুদ্ধে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটানোর দায়বোধকেও তিনি কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীর মূল-স্রোতের ধারায় তিনি প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন। এই যুক্ততা নিছক সৌজন্যে নয়। বৈধী অনুশীলনহীন, চর্চার ধারাচ্ছিন্ন কবি রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যনিরপেক্ষ শিল্পের ভাবনায় ছিলেন যথেষ্ট মনোযোগী। প্রত্যক্ষ চর্চা ব্যতিরেকেই তিনি ভারতীয় শিল্পচর্চার একজন

দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি।' আবার শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, 'বিষম ব্যস্ত ছিলাম। ছুটি আরম্ভ হল। ভাবছি এক কোণে বসে ছবি আঁকায় মন দেব। কলম চালাতে ভালো লাগে না।' এইভাবেই শ্রীমতী রানী চন্দকে আলাপচারিতে জানান, 'আমার ইচ্ছে করছে সব ছেড়ে দিয়ে কেবল ছবিই আঁকি।' শব্দগ্রন্থনে কবির এই অনীহা তবে কি অবনীন্দ্রনাথের মতোই ইচ্ছেকে বশ মানাতে পারার উপলব্ধিতে যুক্ত? অবশ্য সমস্যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দুই শিল্পীর ক্ষেত্রে দুই বিপরীত ধারায় বাহিত। সাহিত্যে যুগধর্ম ও আধুনিকতার ভাবনা তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিমাত্রায় বিব্রত করলেও, ছবির ক্ষেত্রে কবি অনেকখানি নিশ্চিত। ছবির রঙে রেখায় অনাগত রহস্য উন্মোচনের, প্রকাশ-অন্বেষার দুর্নিবার আকর্ষণে কবি শব্দের জগৎ থেকে ছুটি পেতে আগ্রহী।

"রবিবার" গল্পের শিল্পী নায়ক অভীককুমারের মুখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের কথাকেই প্রকাশ করেছেন, 'আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা, ঘানি-ঘোরানো দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে।' ছবি সম্পর্কে স্বদেশবাসীর প্রাথমিক উপেক্ষায় কবি আহত। শিল্পী নন্দলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অগাধ আস্থা, অথচ নন্দলালের শীতল স্বীকৃতি কবিকে তৃপ্ত করে নি। রবীন্দ্রনাথের ছবির বিশ্লেষণে নন্দলাল কখনোই স্পষ্ট নন। তাঁর মতে, গুরুদেবের চিত্রকলায় আছে এক নিজস্বতা, তবু তা ঐতিহ্যের অনুগত। খুবই মূল্যবান দর্শন। অথচ ঐতিহ্যের আনুগত্য-ব্যাখ্যায় শিল্পী তেমন সক্রিয় নন। রবীন্দ্রনাথ তরল উজ্জ্বল জার্মান রঙ পছন্দ করতেন। আর সেই কারণে ইউরোপের চোখ তাঁর এই বর্ণ-উদ্ভাসে আকৃষ্ট হয়েছিল। এভাবে তিনি সহজ মন্তব্যে সিদ্ধান্ত টানেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি আদিম শিল্পের স্বজাতি মনে হলেও শ্রেণীর দিক থেকে এই ছবি আধুনিক ও বুদ্ধিজীবিত। রবীন্দ্রনাথের ছবি ঐতিহ্যের অনুগত হয়েও কেন এবং কোথায় আধুনিক, এই অনুসন্ধানে নন্দলাল তেমন উৎসাহী হন না। সমসাময়িক শিল্পমূল্যায়নের নিরুত্তাপ আবহকে কবি অবজ্ঞায় দূরে সরাতে চেয়েছেন। ১৯৩০ সালে প্রতিমা দেবীকে চিঠিতে জানিয়েছেন, 'আর যাই হোক আমার ছবি দেশে ফিরতে দেব না। অযোগ্য লোকের হাতে অবমাননা অসহ্য।' ছবির গঠন, বর্ণপ্রয়োগ এবং আখ্যানহীনতা তৎকালীন রীতিবদ্ধ চিত্র-অভিজ্ঞতার বিপরীতধর্মী বলেই দেশের অধিকাংশ মানুষ তেমন সাড়া দেয় নি। এমনকী রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে পরিচিত নিকটজনের কাছেও তাঁর ছবি, সাহিত্যের ভাবনার তুলনায় সম্পূর্ণত নতুন। নামগোত্রহীন ছবি তাঁদের অনাস্বাদিত অনুভবে শুধুই বর্ণ-বিলাস।

'যখন সবাই বললে—এ একটা নতুন জিনিস, আমি বললুম, নতুন নয় এ। নতুন হতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথের ছবিকে অবনীন্দ্রনাথ প্রথার মধ্যেই দেখতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবির রেখা, রঙ সবই প্রকৃতির মধ্যে ছড়ানো আছে। মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন—এ-সবকিছুতেই শাশ্বতরূপের লীলার সাক্ষাৎ অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছেন। অবশ্য এ ব্যাখ্যায় স্থিরচিহ্নের নির্দেশ বা নির্দিষ্টতা নেই। প্রকৃতি-বহির্ভূত এমন কোনো কি চিহ্ন সম্ভব যা অভিনবত্বে শুধু নয়, সম্পূর্ণতই নব্য আবিষ্কারের দাবি জানাতে পারে? সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছবিও সে অর্থে ঐতিহ্য-হীন আবিষ্কার নয়। তবু যে কারণে পাশ্চাত্যে গঁ্যগা, পিকাসো, মাতিস প্রমুখেরা আধুনিকতার শিকড়ের খোঁজে ফিরে গিয়েছিলেন লৌকিক শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত সহজতার কাছে, সেখানেই পেয়েছেন গঠনের মৌলিক রূপ যা নতুন করে শিল্পে প্রাণসঞ্চার ঘটিয়েছিল। এই ভাবনার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন শিল্পে মুক্তির কথা। শিশুর মধ্যে সত্যের সংস্কারবর্জিত সরল রূপের আদর্শ যেমন চিরন্তন, সেভাবেই শিশু-

তল্লিষ্ঠ শরিক হয়ে উঠেছিলেন। মূলধারার সমান্তরালে স্বয়ংশাসিত রীতিতে ভারতীয় শিল্পের আত্মতৃপ্ত নিশ্চলতায় তিনি গতির প্রসার ঘটাতে সক্রিয় ছিলেন।

মারিউস দ্য জায়াসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শিল্পী পিকাসো জানিয়েছিলেন, 'আমি যখন আঁকি, আমি দেখাতে চাই আমি কী পেয়েছি, আমি কী খুঁজছি তা দেখাতে চাই না।' ঠিক এভাবে না হলেও রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে তাঁর ছবি সম্পর্কে জানাচ্ছেন, 'সম্পূর্ণ কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে ফাউণ্ডলিং। তাই এদেশের নিষ্ঠাবানদের মহলে ওকে দাঁড় করাতে ভয় করি।'

পিকাসো তাঁর ছবির বিষয় খোঁজেন না, পেয়ে যান। এই পাওয়া তাঁর অভিজ্ঞতার সামর্থ্যে অর্জন। দেখা বা চেনার জহুরি চোখ অথবা মন না থাকলে এভাবে পেলেও তাকে সঠিক ব্যবহারে অনেকেই ব্যর্থ হন। আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বার-বার শিল্পশিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার অভাবকে প্রাধান্য দিতে চান। তবে কি রবীন্দ্রনাথের চিত্রনির্মাণক্ষমতা কোনো দৈব প্রভাবের ফল? তেমন বিশ্বাসের কোনো কারণ ঘটে না। কবির অবচেতনার প্রভাবেও কাজ করে অভিজ্ঞতারই সঞ্চয়। ছবির নির্মাণরহস্যের পিছনে থাকে অর্জিতজ্ঞানের পূর্ণ সামর্থ্য। তা ছাড়া, পিকাসো ধারাবাহিক চর্চায় শিল্পের ভাষারীতি আয়ত্ত করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর ছবিতে সন্ধানের চিহ্নলুপ্ত করার প্রয়াস শিল্পিত কৃৎকৌশলেই যুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রাপ্তির মধ্যেও এক দুর্নিবার সন্ধানের চিহ্ন ছড়ানো, যা তিনি কোনোভাবেই আড়াল করতে পারেন নি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পচর্চার কথা জানিয়েছেন। পরিচয়ের অভাবই এই অনভিজ্ঞতার কারণ, এমন ধারণাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমরা নানা তথ্যে জানতে পারি—বিদেশ-ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ নানা শিল্পীর বিভিন্ন রীতির ছবির সঙ্গে নিয়মিত পরিচিত হয়েছেন। এ ছাড়া, মুদ্রিত শিল্পনমুনা এবং শিল্পতত্ত্ব দর্শন-পাঠে নিয়মিত যুক্ত থেকেছেন। ১৯৩১ সালে দৌহিত্র নীতুকে লেখা চিঠিতে এর প্রমাণ পাই,—'জার্মানিতে Art magazine যা বেরোয়, তারই দু-একটার গ্রাহক হতে চাই। কত দাম লাগে জানালে পাঠিয়ে দোব।' জ্ঞানসঞ্চয়ের তীব্র তৃষ্ণায় আধুনিক ছবিও যে অন্তর্গত, তা বলাই বাহুল্য। আধুনিক শিল্পের মূল ভাবনাকে ১৯২৫ সালে "পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি"তে প্রকাশ করেছেন, 'আধুনিক কলারসজ্ঞ বলছেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিতপটুত্বে বিরল রেখায় যে-রকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তর ভারপীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই।' সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল করে প্রকাশ করা যে-কলাবিদ্যার কাজ, অবান্তরের জঞ্জাল তার সবচেয়ে শত্রু। অবান্তরকে ছেঁটে বাদ দিয়ে রূপের সংযমী সংহত রূপের সাধনাই আধুনিক চিত্র-করদের অভীষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি।

১৯৩০-এ আরব্য রজনীর কাহিনী অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রমালার নির্মাণসমাপ্তি। এরপর বেশকিছুদিন অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন। কারণ হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কী জানি, কেন মন বসত-না ছবি আঁকতে।' রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করে জানতে পারেন, 'এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি; সেইজন্যই চিত্রকর্মে আর মন বসে না।' সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেও থাকে এক ধরনের অনিশ্চয় যন্ত্রণা। প্রতি পদক্ষেপে প্রতিরোধের বাধা ঠেলে ভাবনার যথার্থ প্রকাশেই শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ। অবনীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে এ আনন্দ থেকেই বঞ্চিত ছিলেন। শিল্পীর সৃজনবৈরাগ্যের এই মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ চিত্রসাধনায় নিজেকে যুক্ত করেন। এ ঘটনা অবশ্যই আকস্মিক। তবু কোথায় যেন এক ভাবনার সাযুজ্য মিশে যায়। ১৯৩০-এ প্রতিমা

জন্ম নিয়ে অতি-অলংকারের বন্ধনপাশ থেকে মুক্ত হতে তিনি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শিশুসুলভ নয়, পক্ষান্তরে শিশুসদৃশ সরলতায় আধুনিকতার নব্যচিহ্নে ছবিকে গড়তে চেয়েছেন। ভারতীয় বিশেষত বাঙলার লৌকিক শিল্পনির্মাণের সারল্যকে সরাসরি ছবিতে প্রয়োগ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তেমন ভাবিত ছিলেন না। ছবির গঠনবৈশিষ্ট্যের ধারণা সম্পর্কে এবং নির্মাণ-কৌশলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব এর প্রধান অন্তরায়। বিতর্কিত হলেও একথা অনুমান করা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের গড়ন, বিশেষত জার্মান অভিব্যক্তিবাদীদের চিত্রশৈলী রবীন্দ্রনাথকে প্রবল প্রেরণাযুগিয়েছিল। যদিও ছবির বিষয় ও রূপারোপে ছিল চতুষ্পার্শ্বিক অভিজ্ঞতা, পট বিষয়ের উপস্থাপনায় ভারতীয় প্রথা বা ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম সংস্কার তাঁর ছবির বড়ো অংশ জুড়েই স্থান নিয়েছে। ছবির ভারসাম্য রক্ষায় ছন্দের মাত্রাজ্ঞান এমনই প্রখর ছিল যার সাহায্যে অধিকাংশ ছবিকেই রবীন্দ্রনাথ এক দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করতে পেরেছিলেন। ছন্দের মাত্রাজ্ঞানই এনেছে ছবিতে সতেজ শিরদাঁড়া, যা নব্য-ভারতীয় ছবির সমসাময়িকতায় অধিকাংশেই ছিল অনুপস্থিত।

নন্দলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা ও ভালো-বাসা সত্ত্বেও, নন্দনবোধের পার্থক্য দুজনের চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিল্পরসিক সমালোচকগণের প্রতি অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। কিন্তু যে মুহূর্তে স্বদেশে শিল্পী যামিনী রায়ের মতামত জানতে পারলেন, তখনই তিনি নিজের ছবি সম্পর্কে নতুন বিশ্বাস বা প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হন।

শিল্পী যামিনী রায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপনের কারণ মূলত একটাই। পাশ্চাত্য রীতিবদ্ধ সাদৃশ্যধর্মিতার ঝোঁক-মুক্ত শিল্পশৈলীতে যামিনী রায় আকৃষ্ট ছিলেন। ছবি আঁকার প্রথম পর্বে অবশ্য শিল্পী পাশ্চাত্য সাদৃশ্যধর্মী রীতিকেই অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উজ্জ্বল। ক্রমে-ক্রমে পাশ্চাত্য রীতি-লালিত আলোছায়ার সংস্থান, ত্রি-মাত্রিক বোধ এবং বর্ণযোজনার কুৎকৌশল সম্পর্কে যামিনী রায় মোহ-মুক্ত হন। পাশাপাশি নব্যভারতীয় শিল্প তথা বেঙ্গল স্কুলের বিশিষ্ট পরিচিত রীতির মৃদু কাব্যিক মেজাজকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে, উভয় রীতির গ্রহণবর্জনদ্বন্দ্বে দীর্ঘ যামিনী রায় দীর্ঘ সময় নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। অবশেষে শিশুপুত্রের সরল প্রকাশের উৎসে এবং ভারতীয় লোকশিল্পের সহজ সারল্যে পেলেন শিল্পের শরীর-নির্মাণের দিশা। লোকশিল্পের বাহ্যিক চিহ্নসূত্রকেই অনেকে যামিনী রায়ের শিল্পী-পরিচিতির প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহী। যামিনী রায়ের নামের সঙ্গে কালীঘাট পট আর পটুয়ার অনুষঙ্গ যেন শ্রদ্ধানিবেদন কিংবা সমালোচনার অনিবার্য হাতিয়ার। জীবন-যাপনের মূলধারার সঙ্গে লৌকিক আবহের মিশ্রণে শিল্পী যামিনী রায়কে আধুনিকভাবনাবর্জিত, নব্যশিল্পভাবনার জ্ঞানরহিত এক মাটির মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে কেউ-কেউ সক্রিয়। অথচ যামিনী রায়ের ছবির লৌকিক সারল্যের আড়ালে আছে পাশ্চাত্য শিল্পভাষার আধুনিকতা যা ব্যাপ্তির দিক থেকে দেশকালনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক।

কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে এক আলাপচারিতে যামিনী রায় জানিয়েছিলেন চিত্রনির্মাণের এই বিশিষ্ট লৌকিক রীতি-গ্রহণের কারণ। শিল্পী বুঝেছিলেন, তাঁর পক্ষে ইউরোপের মতো কিংবা চীনা, তিব্বতি, পারসিক বা মোঘল রীতির ছবি আঁকা সম্ভব নয়, কেননা এই পরিবেশ থেকে তিনি বিযুক্ত। তা ছাড়া, ছবিতে মৌলিকতা অর্জনের তাগিদে, গঠন-ছন্দে প্রচলিত ছাঁদের বাইরে ভিন্ন এক রূপের সচেতন গুণ প্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠেন। ছবির ভালোমন্দ এই গুণকে তিনি অস্বীকার করেছেন। বরং প্রথাগত ছবির রূপরীতি থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চিহ্নে নিজেকে প্রকাশ করাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে মেনেছেন। যামিনী রায় পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পবোধ এবং রূপরীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন প্রয়াসে লৌকিক শিল্পচিহ্নের বিশিষ্ট রূপকে আত্মীকৃত করেছিলেন। সুতরাং যামিনী রায়ের ছবি সংকীর্ণ দেশজ রূপচিহ্নে বন্দী নয়, বরং দেশজ বৈশিষ্ট্যসমূহকে বহির্দেশীয় শিল্প-কুৎকৌশলের বিবিধ রীতির সঙ্গে যুক্ত করেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ভারতীয় শিল্প, যা আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পধারায় মূল স্রোতেই যুক্ত। রবীন্দ্র-নাথের ছবির ভাষার সঙ্গে যামিনী রায়ের শিল্প-ভাবনার এখানেই নৈকট্য স্থাপিত হয়। এখানেই গড়ে ওঠে দুজনার সূক্ষ্ম সম্পর্ক।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে যামিনী রায় 'খাঁটি ইউ-রোপীয়ান আঙ্গিক'—এমনই দ্বিধাহীন নির্দেশে চিহ্নিত করতে চান। রিয়ালিজমে ক্লান্ত ইওরোপ নতুন রূপের সন্ধানে তৃষ্ণার্ত। এ যেন প্রগতির এক ভিন্নতর সংকট। আদিম যুগে এ সমস্যা ছিল না। শিল্পে অবিমিশ্র সত্যের প্রকাশ ঘটেছিল স্বাভাবিক ছন্দে। কিন্তু সভ্যতার আচরণ নয় সত্যের ওপর কৃত্রিমতার আড়াল গড়ে তুলল। শিল্পসৃজনের সহজতায় দেখা দিল আড়ম্বরের বিড়ম্বনা। সহজাত আবেগের পরিবর্তে এল যান্ত্রিক শৈলীর প্রাণহীন ঔজ্জ্বল্য। এর পরে আবার সেই সহজাত আবেগের চর্চাই আধুনিক শিল্পশৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে গৃহীত হল। রবীন্দ্রনাথের ছবিকে যামিনী রায় এই চেতনার সঙ্গী হিসেবেই দেখাতে সচেষ্ট। যামিনী রায় কবির ছবি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা শুধুমাত্র ছবির গুণবিচার নয়, ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে ছবির বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করা। তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপ-বোধের যে আভাস পাই তার জন্য।' যামিনী রায় ছবির তাৎপর্যের তুলনামূলক আলোচনায় বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দুশ বছর ধরে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান। ছবির জন্য খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।'

ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা যে সূত্রের খোঁজে আগ্রহী, যামিনী রায়ের অন্বেষা যেন সেই চেতনারই সঙ্গী। আর এই বিশ্বাসেই যামিনী রায়ের চিত্রবিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় আস্থাবান। চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচার-শক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, সে অবস্থা যে আমাদের দেশে গড়ে ওঠে নি, তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এমন ভাবনার সঙ্গে যখন বিশেষ ভাবে যুক্ত হয়, 'এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে', তখনই প্রশ্ন জাগে মনে, রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের' বলতে বিশেষভাবে কী নির্দেশ করতে চান? সম্ভবত তিনি চিহ্নিত করতে চান তাঁদের, যাঁরা কালাপাহাড়ি ভয়ঙ্করতায় প্রচল ছক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চান সৃজনের মুক্ত অঙ্গনে। ঐতিহ্যকে মেলাতে চান আধুনিক শিল্পভাষার শরীরে। গড়ে তোলেন নতুন এক শিল্পভাষা যা সংস্কারবাদী ধারণার বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত। আর সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের আধুনিকতাবোধের নিকটবর্তী আপনজন হওয়ার বাসনায় উদ্‌গ্রীব। পরস্পর ভাষা বিনিময়ের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী খুঁজে পান। ভারতবর্ষকে কবি 'আবৃত দৃষ্টির দেশ' বলেই অভিহিত করতে চান। যামিনী রায়কে চিঠিতে জানান, 'কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন বলে

আমার বোধ হয় নি।' শিল্পীর কাছে কবি যত সহজ আবেগে মনের ভাবনাকে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সে সহজতা কবি বা ভাবুক শ্রেণীর মানুষের কাছে পান না। এর পিছনে কাজ করে পারস্পরিক ভাবনার বিচ্ছিন্নতা। তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গেও কবির একসময় সাহিত্যভাবনার দূরত্ব দেখা গিয়েছিল। সেও ছিল আধুনিকতারই সংকট। জীবনানন্দের কবিতার সূক্ষ্ম জীবনবোধের মধ্যেও কবি দেখেছিলেন শুধুই চিত্ররূপময় নির্মাণ। অথচ কবিতার আধুনিকতা প্রসঙ্গে শিল্পী যামিনী রায়ের সরল মন্তব্য বিস্ময়কর। 'আমার কাছে এইজন্যে একটু শুধু ভালো লাগে যে কবিতাতে যদি এইসব উপদেশের কথা থাকে, আমার কাছে তা মোটেই ইয়ে লাগে না, বরঞ্চ কিছু কোনো কথা যদি না থাকে, শুধু শব্দ বসিয়ে যায়, কোনো মানে হয় না, আমার কাছে সেটা তো ঢের বড় বলে মনে হয়।' কাহিনীমুক্ত মিতভাষণে কবিতার শরীরে বাহুল্যহীন যে ব্যঞ্জনা যামিনী রায়ের কাঙ্ক্ষিত, তার সঙ্গে শিল্পীর শিল্পসৃজনের সারল্যও অঙ্গীভূত। আধুনিকতার একই মাত্রায় দুই বোধ যুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবির আখ্যানহীন, নামহীন অস্তিত্ব যে আধুনিক বোধে স্থিত, সাহিত্যের শরীরনির্মাণে সে রীতিভাবনায় যুক্ত নয়। বরং সংস্কারের তীব্র শাসনে তা বন্দী। 'চিত্রকর গান করে না: ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে "অয়ম্ অহম্ ভো"—এই যে আমি এই।'—আধুনিকতার যে বোধে রবীন্দ্রনাথের চিত্র এই আমিত্বের উপলব্ধিতে আসীন, তারই বিপরীতে সাহিত্য আশৈশবলালিত শিক্ষা আর অর্জিত অভিজ্ঞতার অনিবার্য সংস্কারে বৃত্তবন্দী—সাহিত্য ও শিল্পে বিপরীতমুখী দুই আধুনিকতার দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ দীর্ণ।

উদ্‌ধৃতি এবং আলোচনার সহায়ক সূত্র :

১। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ : শঙ্খ ঘোষ।
২। দেশ, ৫ই অগস্ট ১৯৮৯।
৩। নির্মাণ আর সৃষ্টি : শঙ্খ ঘোষ।
৪। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৯৭৩।
৫। ওই, ১৯৭৪।
৬। ওই, ১৯৭৫।
৭। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৮। রবীন্দ্রচিত্রকলা, রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা : সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। পরিচয়, ১৯৮২ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা।
১০। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ : রানী চন্দ।
১১। যামিনী রায় : বিষ্ণু দে, আশা প্রকাশনী, ১৩৮৪।

বলি

অবিনাশ ঢোড়স

আজ পঞ্চম দিন। মায়ের শিয়রে বসে থাকতে-থাকতে পিঠের আর কোনো সাড় নেই। চোখেও এখন আর জল আসে না। অথচ প্রথম দিন চোখের জল ধরে রাখা যায় নি। যন্ত্রণায় ছটফট করছে মা। চোখে দেখা যায় না। এভাবেই রোজ সকাল থেকে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে রাত। একদিন-একদিন করে আজ পাঁচ দিনে ঠেকেছে। যন্ত্রণাকাতর মাকে দেখে এখন আর ততটা কষ্ট হয় না। খুব কষ্ট হলে তৃষ্ণাকাতর মায়ের মুখে তুলে দিই জল। আর কোনো কাজ নেই। ঝোপড়ির বাইরে বিড়ি ধরিয়ে বসে থাকে বাবা। মাঝে-মাঝে গ্রামের দু-একজন লোকজন এসে খোঁজখবর নিয়ে যায় মায়ের। ব্যাস, এইটুকুই।

মায়ের সবচেয়ে আদরের সুমি প্রথম দিন ফুলে-ফুলে কেঁদেছিল। মায়ের হাতে ছাড়া কিছুতেই খাবে না। কিন্তু কেউ নজরই দেয় নি ওর দিকে। শেষে কাঁদতে-কাঁদতে ওইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মায়ের পায়ের কাছে বসে বাবা নিঃশব্দে লক্ষ করছিল তার কাতরানো। আর কীই বা করার ছিল তার। শুধু ঢুলুনি আসতেই চটপট ধরিয়ে ফেলছিল বিড়ি আর নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছিল। সারা রাত না কারো খাওয়া-দাওয়া, না ঘুম। আজ যেন সবকিছু থিতিয়ে এসেছে। যেন কারও কিছু করার নেই, শুধু শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করা ছাড়া।

মায়ের পাশে বসে থাকা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। হাওয়া নেই কাপড়ঘেরা এই ছোট্ট জায়গায়। সমস্ত শরীর থেকে উঠে আসছে দুর্গন্ধ। মায়ের শরীরে আর কিছু নেই। শুধু বাবার পুরনো ছেঁড়া একটা ধুতি কোমরের ওপর পড়ে আছে। তাও যেন মায়ের সহ্য হচ্ছে না। অগোছালো কাপড় ঠিক করতে গেলে হাতে উঠে আসছে পচা গলা মাংসের ছাল। শুধু ঘাড় আর পায়ের অল্পবিস্তর নড়াচড়ায় বোঝা যাচ্ছে এখনো শরীরে সাড় আছে। বাকি সব-কিছুই নির্জীব, শান্ত। বাকি সব-কিছুই নিস্পন্দ।

কেঁচোর মতো নড়াচাড়া করছে পেটের নাড়ি-

ভুঁড়ি। আজ পাঁচদিন উনুনে আঁচ পড়ে নি। পড়শি ভানু আর কাকিমার ঘর থেকে চা-জল ছাড়া কিছুই আসছে না আর। গত দুদিন সুমিকে বাইরে রাখা হয়েছে। বিড়ি খেয়ে-খেয়ে পেটের আগুন নেভাতে চাইছে যেন বাবা। আসলে দুর্গন্ধে ঘরে বসে থাকা দায়, তাই বিড়ি খাওয়ার অছিলায় বারবার দাওয়ার ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে শ্বাস নিচ্ছে বাবা। খিদের চোটে সারা শরীর ক্রমশ কাঠ হয়ে আসছে। গলা দিয়ে একটোঁক জলও নামছে না আর। মায়ের পা নড়ে উঠতেই, পায়ের কাছে গিয়ে বসলাম। পোড়া চামড়া আর থ্যাঁতলানো মাংসের ওপর ভনভন করছে মাছি। বাবা তো পাথর হয়ে গেছে। আমি আর পারলাম না, পেছনে সরে এলাম। মায়ের দিকে তাকানোর সাহস আমি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। আমার দোষেই দুখিনী মা আমার চোখের সামনে ধীরে-ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। উন্মাদের মতো মাথা নাড়তে-নাড়তে বাবা দাওয়ায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। আগড় দিয়ে একঝলক আমাকে দেখল। আর আমার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। বাবাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যায় আমি বুঝতে পারছিলাম না।

'এত যে শিথলি, কিছুই কাজের হল না'—ডুমো মাছির মতো, তার কাতরোক্তি আমার কানে ভনভন করছিল।

মামা, মাসি আর শান্তাদের খবর পাঠানো কোনো মতেই সম্ভব ছিল না। অথচ শেষ সময়ে শান্তা নেই ভেবে বড়ো খারাপ লাগছিল। গ্রামের যা অবস্থা বেওয়ারিশ কুত্তারাও গ্রামের সীমানা মাড়াতে সাহস করে নি। এ অবস্থায় মায়ের গলা, ঝলসানো শরীর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। অল্প খানিক নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে কাপড়ঘেরা ঝোপড়ির এই প্রায়ান্ধকার কোণে।

আমাদের চেয়ারম্যান এসাজী আমাদের জলে-পুড়ে থাক হয়ে যাওয়া ঝোপড়ির ছাই চাকরের হাত দিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছেন নদীর গর্ভে। কত কাকুতিমিনতি করলাম। বুড়ো বাপ তো পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। অথচ গ্রামের কারও মন টলে নি। সবাই পাথরের মতো অচল অটল। আমার মনের ভেতর বিদ্রোহের যে আগুন ঝিকিয়ে উঠেছিল, সব মায়ের শরীরের মতোই জলেপুড়ে থাক হয়ে গেল। মনটা ব্যথায় ডুকরে উঠল।

এস. টি. বাসের আসাযাওয়া অব্যাহত রয়েছে। মা পুড়েছে একথা আর কেউ বলে না। ডাক্তারও আসে না কোনো। নিজের পেটের সন্তান শান্তাকে অবধি একটা খবর দেওয়া যায় না। মায়ের পায়ের কাছে কুঁকড়ে বসে শুধু অক্ষম কুকুরের মতো কেঁউ-কেঁউ করা। এ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

বাবা জিজ্ঞাসাবাদ করে ফিরে এল। কিছুই হওয়ার নয়। গ্রামে কোনো প্রাণ নেই যেন। আলোড়ন নেই। মাঙবাড়া, মাহারবাড়া, আদি চণ্ডাল-বস্তিগুলিও নিপাট ঠাণ্ডা মেরে আছে। চারদিন উজবুকের মতো অপেক্ষা করে-করে শেষমেশ অধৈর্য হয়ে কচরুবাকে সঙ্গে নিয়ে বাপুরাওয়ের কাছে গেলাম।

কচরুবা বলল, সবই তো শেষ হয়ে গেল। মরণ-কালে মেয়ের সাথে অন্তত দেখা করতে দাও। একটু শান্তি পাবে মনে।

—কচরু।

—আজ্ঞে।

—এ ব্যাটার বাপকে কী বলেছিলাম।

—কিন্তু···

—যা বলেছিলাম, ঠিকই বলেছিলাম। বুঝেছিস।

—কিন্তু সরকার, নিজের পেটের সন্তান···

—অই পোড়া শরীল ধুলোয় মেশার আগে নয়, আমার সাফ কথা।

—আপনি গাঁয়ের মালিক, অই দামড়া ছোঁড়াটার কথা কেন গায়ে মাখচেন।

—ছোঁড়াটা গোবর খেয়েচে।

—হুজুর, মাই বাপ আমার। বারকুর দিকে একবার তাকান। গাঁয়ের নিয়মকানুন কি ও জানে সাহেব?

—কেন, ও তো পণ্ডিত মানুষ, দিগগজ। পুলিশ নিয়ে আসবে বলেছিল। যাক না, নিয়ে আসুক পুলিশ।

—হুজুর, ভুল তো আমি স্বীকার করছি। কিন্তু শান্তাকে একটা খবর পাঠানো খুব দরকার। মেয়েরা শেষ দেখা দেখবে না মাকে।

—কেন, সব গুমোর শেষ হয়ে গেল এর মধ্যেই। খুব যে পুলিশ ডাকতে গিয়েছিলে।

—মাপ করুন, হুজুর মায়ের যা অবস্থা···

—মরছে তো মাগিটা, মরতে দে। একটা মাহারের বউ মরলে গাঁ-গেরাম খালি হয়ে যাবে না।

সব হজম করলাম। ছুঁচোর মতো ফিরে এলাম গ্রামে।

আজ মায়ের শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। আর সহ্য করা যায় না। পাগল হয়ে যাব। মা না মরলে এসব থেকে নিষ্কৃতি নেই। বারোয়ারি কুয়োতলা সেইরকমই থাকবে, শুধু আমার মা-ই আর থাকবে না, আমার ভেতরের আগুনটাকে উশকে দিতে শেখাবে না প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে। ওঃ মা, আমার একমাত্র ভরসা! বাপ তো শালা ভীতু, একটা কেন্নো। সেবার কুয়োর জন্য সংঘর্ষে একমাত্র মাই গিয়েছিল। বাপ একটা রাও কাড়ে নি, মুখ বন্ধ করে ছিল। এসব ভাবলে বুকটা ফেটে যায়, কান্না ঠেলে আসে। মাকে জড়িয়ে ধরে মাফ চাইতে ইচ্ছে করে অথচ এতসব হয়ে যাবার পরও অদ্ভুত শান্ত ছিল মা, একবার ভুলেও দোষারোপ করে নি আমাকে।

সেবার গ্রাম-পঞ্চায়েতের ইলেকশনের সময় আমার দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ছিল। ইনামদার একদিন বাড়িতে ডেকে খুব গালিগালাজ করল আমাদের। বাবাও তাকে পালটা গালিগালাজ দিল। বাপের এরকম গালিগালাজ করাতে মা তো খুব খুশি। পুলিশ ফোর্স ডাকা হল। আজও ছবির মতো সব চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

খিদেয় পেটের নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে আসছে। একটু গড়িয়ে নিলাম ওইখানেই। শুয়ে-শুয়ে লক্ষ করলাম মায়ের শরীর থেকে জল গড়াচ্ছে। পচা গলা শরীর থেকে উঠে আসছে চামড়াপোড়ার গন্ধ। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর পারা যায় না, আমি হুড়মুড় করে ছুটে বাইরে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠলাম।

আর চমকে উঠে বাবা চেঁচিয়ে উঠল—কী হল?

—কিছু না।

—খুব থকে গিয়েছিস তো। একটু গড়িয়ে নে।

চেঁচিয়ে উঠলাম—ন-না।

হাতটা ঝেড়ে উঠতে যাব। দেখি হাতে মায়ের শরীরের পোড়া মাংস। আঙুলে আঠা-আঠা ভাব। সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। গলা শুকনো। জল খেলাম এক ঢোক, আর তখনই খিদেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ফের।

সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে, যেন লুকিয়ে-লুকিয়ে এল সোমা আর চিনাই। সোমা বসল বাবার পাশে। চিনাই ওর আঁচলে ঢাকা রুটি আর তরকারি বের করে বলল, 'কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে?'

আমি আর কান্না চাপতে পারছিলাম না। গোঙানির মতো একটা খিন্ন আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

—চুপ চুপ। মানুষকে তো একদিন মরতেই হয়।

আমার চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছিল। ও আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'যা হবার তা তো হল' বলে মাঝপথেই হঠাৎ চুপ মেরে গেল। আমি বুঝতে পারলাম না ও কী বলতে চায়।

বাবাকে বলল, 'ঠাকুরপো, তুমি একে একটু বোঝাও না। সোমখ ছেলে, কতক্ষণ আর এরকম বসে থাকবে?'

বাবা লাল চোখ মেলে আমাকে দেখল। আমি কিছুতেই তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণ এভাবেই কাটল। শেষে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বাবা থেঁকিয়ে উঠল: 'তখন আমার কথা শুনলি না রে, হারামজাদা। এখন আর কেঁদে-কেটে কী হবে।'

'আউড়ু' পঞ্চায়েতের ইলেকশনে নির্বাচিত হওয়ার পর একটি বারোয়ারি কুয়ো বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাহারবাড়া, মাঙবাড়া কুয়ো বানানোর সপক্ষে ছিল। বাবা এর বিপক্ষে ছিল। আমি তো খুব উৎসাহী ছিলাম। বাবাকেও পাত্তা দিই নি। অবশেষে অনুষ্ঠানের দিনও স্থির হল। আমাদের চেয়ারম্যান, আলু মালি, গণপৎ তেলি প্রমুখরা এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিল। স্বভাবতই গ্রামের পরিস্থিতি ছিল থমথমে, গম্ভীর। অনুষ্ঠানের সময় সব লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে এল ওরা। অবস্থা দেখে সীতারামকে পুলিশ ডাকতে পাঠানো হয়েছিল। মাঝদুপুর হতে চলল অথচ তার পাত্তা নেই। শুধুই উৎকণ্ঠা, শুধুই প্রতীক্ষা। চারটে নাগাদ গ্রামের প্রবেশপথে পুলিশের জীপ দেখা গেল। আমি আর আউড়ু এগিয়ে গেলাম আর মায়ের নেতৃত্বে মাঙবাড়া, মাহারবাড়ার মেয়েরা নতুন কুয়োর জল তোলা শুরু করল। আর ঠিক তখনই লাঠির প্রথম আঘাতটা এসে পড়ল আমার মাথায়। মা আর অন্যান্য মেয়েদের রক্তে রাঙা হয়ে গেল আমাদের কুয়োতলা। ততক্ষণে পুলিশ এসে ধরে ফেলেছে মারমুখী বাবুরাও, গণপৎ আর সরপঞ্চ-দের। হাতকড়া পরিয়েছে এতসব কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পর। মনে আছে, সাত-আট দিন পরই সব ছাড়া পেয়ে ফিরে এল গ্রামে।

দিন কাটতে লাগল আগের মতোই। বাবুরাও বা গ্রামের কেউই কিছু বলল না। একদিন দুদিন করে মাস দুয়েক কেটে গেল। চণ্ডাল বস্তি চুপচাপ। হঠাৎই একদিন আউড়ুর ঝোপড়ি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মাকে ভেতরে ঢুকিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল আমাদের ঝোপড়িও। টের পেতে জ্বলন্ত মাকে এক সময় অনেক কষ্টে বাইরে বের করে আনা হল পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া আমাদের ঝোপড়ির থেকে। সীতুয়াকে পাঠানো হল পুলিশ ডাকতে। পরদিন সকালে কোমরভাঙা সীতুয়ার লাশ ভাসতে দেখা গেল নদীতে। অথচ কারো মুখে টু শব্দটি নেই।

সব রাস্তা বন্ধ। একদিন দুদিন করে আজ এই পঞ্চম দিন। আমার দোষেই মা আজ মড়ার মতো পড়ে আছে। চোখের সামনে।

—ব্যাটা, এক গ্রাস খেয়ে নে।

আমি চোখ মেলতে পারছিলাম না।

—ইশ, এমন করছিস কেন। পাঁচদিন না খাওয়া না ঘুম।

ঢুলুনিতে মাথা পায়ে এসে ঠেকেছে। সারা শরীর ঝিমঝিম করছে। মায়ের শরীর থেকে অবিরত জল ঝরে যাচ্ছে। গড়িয়ে-গড়িয়ে জল এসে ঠেকছে হাতে। হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা গেল। সম্ভবত চিমা চলে গেল। আমি কি বধির হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। পেটের ভেতর কেউ যেন জলন্ত কাঠ দিয়ে ক্রমাগত খুঁচিয়ে যাচ্ছে।

গড়িয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ধপ করে কিছু একটা মুখে এসে পড়ল। চমকে উঠে, তুলে দেখি মায়ের হাত। পচা মাংস দিয়ে জল ঝরছে। হাতটা তুলে দিলাম মায়ের পাশে। নাকের সামনে হাত মেলে দেখলাম নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো শব্দ নেই। আমার হাত থরথর করে কেঁপে উঠল। তবে কি মা শেষ হয়ে গেল। আমার চোখে জল এল না। প্রচণ্ড খিদেয় আর থাকতে না পেরে চিমার আনা রুটির টুকরো মুখে ঠুশে দিলাম। রুটিতে পোড়া মাংসের গন্ধ। আমার মায়ের শরীরের।

অনুবাদ: সুকুমার চৌধুরী

ব্যক্তিগত জীবনে অবিনাশ ঢোড়স মিলীন্দ কলা মহা-বিদ্যালয়ের মারাঠি ভাষার অধ্যাপক। মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্যে শ্রীঢোড়সের অবদান অসাধারণ। মাঙঠার দলিত মানুষদের সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ ও দৈনন্দিন জীবনের ছোটো-ছোটো ঘটনা তাঁর সংবেদনশীল কলমে আপোসহীন-ভাবে ফুটে উঠছে অনেক ছোটোগল্পে। সমসাময়িক অনেক চরিত্রবান মারাঠি কাগজে তাঁর ঝকঝকে ঋজু গল্পগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকে। বী. রঘুনাথ কথা স্পর্ধা, আন্না ভাউ সাঠে লোকনাট্য লিখন স্পর্ধা ইত্যাদি অনেক প্রতিযোগিতায় তাঁর লেখা পুরস্কৃত হয়েছে। এ ছাড়াও 'নসলেলা গাঁও', 'বারশালা জেবুনবসলায়', 'আহুতী' ইত্যাদি স্বরচিত নাটক পরিচালনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

পাগলের প্রলাপ

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

'মরিবার হল তার সাধ'

প্রায় দাবানলের মতোই খবরটা ছড়িয়ে গেল গ্রামে। যে, পাঁচুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কাকভোরে দীঘিতে চান করতে যাওয়া বেণুপিসির প্রতিদিনকার অব্যেস। কী শীত, কী গ্রীষ্ম—এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। গ্রাম সম্পূর্ণ জেগে ওঠার আগেই বেণুপিসি দীঘিতে পৌঁছে যাবে। গত রাতের একগাদা এঁটো বাসন মাজবে। কাপড়চোপড় কাচবে। তারপর চান-টান সেরে ভরা এক কলসি জল নিয়ে ঢুকবে বাড়িতে। সেদিনও চারপাশ যখন প্রখর নির্জন, বেণুপিসি ছাইমাটি দিয়ে দাঁত ঘষতে-ঘষতে নামতে যাবে জলে, এমন সময় ব্যাপারটা নজরে এল তার। এখনও শীত চেপে পড়ে নি। তবুও ভোরের দিকে জমাট কুয়াশা। ভালো করে ঠাওর না করলে দু-হাত দূরের কোনোকিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। দীঘির দক্ষিণপাড়ে বহুদিনের পুরোনো এক বটগাছ। আনমনা বেণুপিসির হঠাৎই খেয়াল হল বটগাছের গোড়ায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। একটু পর থেকেই, বেলা যত বাড়বে, গ্রামের বউঝিদের ভিড় বাড়তে থাকবে এই দীঘির পাড়ে। কলকল করে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করবে সব আর গা খুলে চান করবে। মেয়েদের উদোম শরীর দেখতে কেউ গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে নেই তো? এরকম লোক পৃথিবীর সর্বত্র যখন আছে, তখন এই গ্রামে থাকাও অসম্ভব কিছু নয়। সন্দেহটা মনে আসতেই বেণুপিসি দাঁড়িয়ে গেল। কর্কশ, খনখনে গলায় হাঁক পাড়ল—কে র‍্যা ওখানে ওলাউঠো? গাছের আড়ালে কী কাজ?...

উত্তর কিছু না পেয়ে পিসি এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। একটা লোকই বটে। তবে লোকটার হাতে, মনে হল, একগাছা দড়ি। আর সেই দড়িটা সে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মাটি থেকে দশ-পনেরো হাত উঁচু একটা শক্ত ডালের দিকে ছোঁড়বার চেষ্টা করছে। পিসির অভিজ্ঞ চোখ ব্যাপারটা ততক্ষণে ধরতে পেরেছে। কী সর্বনাশ! লোকটা তো গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বার বন্দোবস্ত করছে! আরও একটু কাছাকাছি গিয়ে লোকটাকে স্পষ্ট চিনতে পারল পিসি। পাঁচু—পঞ্চানন। পদবী—গরাই। মা ছাড়া পাঁচুর কেউ নেই। বেশ লেখাপড়া-জানা ছেলে সে। বি. এ. পাশ। কোন্ একটা স্কুলে মাস্টারি করে। বয়সও বেশি নয়। ত্রিশ-বত্রিশ। কিন্তু হঠাৎ কী এমন ঘটল ওর জীবনে? যে, ভোর না হতেই একগাছা দড়ি হাতে চুপিচুপি গাছে ঝুলে পড়ার ধান্ধা করছে?

তাড়াতাড়ি পিসি গিয়ে সামনে দাঁড়ায়—পাঁচু, বাবা পাঁচু, এ কী করছ?

পাঁচু অবশ্য পিসিকে দেখে তেমন ভড়কাল না। শুধু একবার তাকিয়েই হাতের দড়িটা আবার টিপ করে ছুঁড়ে দিল নুয়েপড়া ডালটার দিকে।

—পাঁচু, এসব কী করছ, বাপ? তোমার মনে কি কোনো দুঃখ আছে?

এবার পিসির দিকে সোজাসুজি তাকাল সে। তার মুখে অবশ্য দুঃখের ছাপ তেমন কিছু নেই। বরং সে ফিক করে হেসে পিসিকে জানাল—আমি আর বাঁচতে চাই না, পিসি।

—ওমা, এ কী অলক্ষুনে কথা? কেন, হলটা কী? কতদিন ধরে তোর মাকে বলছি একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে......?

—পৃথিবী ইদানীং বড়ো নোংরা হয়ে গেছে পিসি। অনেককিছু দেখে...জেনে...আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না...।

দড়িটা এইবার ডালে ঠিকঠাক আটকেছে। পাঁচু সেটা টেনে পরখ করে দেখে নিচ্ছিল যে, ডালে দড়িটা ঠিকমতো বসেছে কিনা। নাঃ—পাঁচুর মাথাটা বোধহয় বিগড়েছে। সত্যি-সত্যিই না ঝুলে পড়ে ডালে। আর দেরি করলে বিপদ আছে। এখনই চেঁচামেচি করে লোকজন ডাকতে হবে। পিসি ভাবছিল। আর পিসির ভাবনাটা যেন পাঁচু ধরতে পেরেই বলল—কেন মিছিমিছি আমার জন্যে ভাবছ পিসি? একা, একা, নির্জনে, নিশ্চিন্তে আমাকে একটু মরতে দাও না...।

—একটু মরতে দাও না...। পিসি এবার রেগেমেগে ভেংচে উঠল পাঁচুকে।—তোর ঠিক কী হয়েছে আমায় খুলে বলবি তো। মরে যাওয়াটা হাতের মোয়া...না?

—কাল বিকেলে ঘরের চৌকাঠে পা আটকে পড়ে গেসলুম। মাথাটা চেয়ারের কোনায় লেগে কেটে গেল। বেশ রক্তপাত হয়েছিল—এই দেখো না। চুলে বোঝাই ঝাঁকড়া মাথাটা পাঁচু নীচু হয়ে এগিয়ে দিল। কপালের ডানদিকে তুলো লাগানো। বেশ ফুলেও আছে জায়গাটা। পিসি দেখল।

—বেশ, তাতে হলটা কী?

—পড়ে যাবার পর খানিকটা সময় ঝিম মেরে ছিলুম। ওষুধ-টষুধ লাগাবার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খানিকটা। ঘুম থেকে উঠেই কীরকম মনে হতে লাগল।

—কী রকম রে?

—মনে হচ্ছিল—মাথার ভেতর একটা জানলা যেন হঠাৎ খুলে গেছে। আর সেই খোলা জানলাটা দিয়ে আমি অনেক কিছু পষ্টো দেখতে পাচ্ছি। কত চেনা মানুষ নজরে এল। বাইরে সবাই বেশ ভালো, কিন্তু গোপনে কত কুকীর্তি করছে। সমাজের মান্যি-গন্যি মানুষ সব! তাদের আমরা কতই না শ্রদ্ধাভক্তি করি। তারা যে এত খারাপ কাজ করতে পারে!...ওহ্, আমি আর দেখতে পারলুম না!...চোখ বন্ধ করে দিলুম। মাথাটা দুহাতে চেপে পাঁচু বেদম ঝাঁকাতে লাগল। বেণুপিসির বুঝতে বাকি রইল না যে, পাঁচু পাগল হয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে চেঁচাতে লাগল পিসি—ওগো, কে কোথায় আছ? শীগগির এসো। আমাদের পাঁচু পাগল হয়ে গেছে! গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে!

পিসির চিৎকারে অবশ্য কাজ হল। ধীরে-ধীরে লোকজন জড়ো হতে লাগল গাছতলায়। কয়েকজন হিড়হিড় করে পাঁচুকে টেনে আনল বটগাছের তলা থেকে। গাছের ড'লে দড়িটা হনুমানের লম্বা লেজের মতো ঝুলছিল। একজন তাড়াতাড়ি গাছে একটু উঠে ডালটা থেকে দড়িটা খুলে নিল। কিন্তু পাঁচু তখন দারুণ ছটফট করছে। বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলছে —আমার কথা শোনো তোমরা! আমাকে মরতে দাও ···আমার দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে। পরদা সরে গেছে। ···আমি ভেতরের সব দেখতে পাচ্ছি গো! আমি আর দেখতে চাই না,···আমাকে মরতে দাও তোমরা···।

হরেন গোঁসাই গ্রাম-পঞ্চায়েত মেম্বার। বিচক্ষণ লোক। পাঁচুর কাছে এসে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল—কী দেখতে পাচ্ছিস রে, পাঁচু?

—অনেক কিছু···।

—যেমন? বল্ না।

—না থাকগে। পাঁচু ফিক করে হেসে বলল। —সেসব তোমাদের শুনতে ভালো লাগবে না। সব সত্যি কথা। সত্যি কথা কি কারোর শুনতে ভালো লাগে নাকি?

—অহ···ভারী আমার সত্যি বলনেঅলা এসেছেন রে? নিয়ে চল্ ওকে। সত্যিই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

পাঁচুকে টেনে-হিঁচড়ে কোনোক্রমে হাজির করা হল তার বাড়ির উঠোনে। ছেলের রকমসকম দেখে তো পাঁচুর মায়েরও ভিরমি খাবার যোগাড়। হরেন সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল—কেঁদো না পাঁচুর মা। শুনলাম কাল পড়ে গিয়ে পাঁচু কপালে আঘাত পেয়েছে। হয়তো যন্ত্রণায় ঠিকমতো ঘুম হয় নি ওর। তাই পেট গরম হয়ে ভুল বকছে। আমি এখুনি লোক পাঠিয়ে ভবতোষ ডাক্তারকে ডেকে আনছি। দু-তিন পুরিয়া ওষুধ পেটে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

উঠোনে গাদা লোকজনের ভিড় দেখেই বোধহয় পাঁচু হঠাৎ কী রকম চুপচাপ হয়ে গেছে। দাওয়ায় পাতা মাদুরে পা ছড়িয়ে বসে ডুলজুল করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ যাতে ছুটে পালাতে না পারে সেজন্যে ছেলে-ছোকরারা হরেনের নির্দেশমতো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। হরেন ভাবল, একটু গরম দুধ খাওয়ালে হয় ছেলেটাকে।

—পাঁচু, একটু দুধ চলবে, বাবা?

পাঁচু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল—দুধ-ফুদ নয়। একটা বিড়ি ছাড়ো তো কাকা। চমকে উঠল হরেন। প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তার। এ অঞ্চলের সবাই বেশ মান্যি-গন্যি করে তাকে। পাঁচুও তাকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে। আর যতদূর সে জানে, এ ছোকরা তো বিড়ি-সিগরেট খায় না। এইবার সে আরও নিশ্চিত হল যে, পাঁচুর মাথা পরিষ্কার বিগড়েছে।

—আছে? কাকা? আবার হাত বাড়াল পাঁচু। বিড়ি না দিলে আবার যদি চেঁচামেচি শুরু করে এই আশঙ্কায় হরেন ভীষণ অস্বস্তির সঙ্গে একটা বিড়ি দিল পাঁচুকে। বিড়িটা ধরিয়ে বেশ সহজভাবেই ধোঁয়া ছাড়তে লাগল পাঁচু। সে দৃশ্য দেখে পাঁচুর মা অদূরে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। আর দেরি না করে হরেন সাইকেলে ছুটো ছেলেকে পাঠাল ডাক্তারের বাড়ি।

পাঁচুর দিব্যদৃষ্টির ফলাফল

ভবতোষ সামন্ত এই অঞ্চলের বেশ নামী ডাক্তার। লোকে বলাবলি করে তার ওষুধে নাকি জাদু আছে। কয়েক পুরিয়া পেটে পড়লেই মরো-মরো রুগীও লাফ দিয়ে উঠে বসে বিছানায়। স্টেশন থেকে বেরিয়ে, কয়েক-পা এগিয়েই পাকা রাস্তার ধারে তার বিশাল তিনতলা বাড়ি গেটের বাইরে থেকে দেখা যায়, ভেতরে উঠোনে বাঘের মতো এক কুকুর লকলকে জিভ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

আধঘণ্টার মধ্যেই মোটরবাইকে বিকট আওয়াজ তুলে ডাক্তার পাঁচুদের বাড়ির উঠোনে এসে হাজির হল। পাঁচু চুপচাপ মাদুরে বসে ঝিমোচ্ছিল। ডাক্তারকে দেখে নড়েচড়ে বসল। থলথলে, গম্ভীর মুখ, গলায় স্টেথিসকোপ। ডাক্তার হরেনকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার, মেম্বার সাহেব? আপনার লোকেরা আমার কাছে গিয়ে বলল যে, রুগী নাকি মরোমরো। এ তো দেখছি দিব্যি বসে প্যাট-প্যাট করে তাকাচ্ছে। কী হয়েছে ওর?

হরেন তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কানে-কানে পাঁচুর কেসটা সংক্ষেপে বলল। শুনে ডাক্তারের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচুকে বলল—শুয়ে পড়ো। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ফিক করে হেসে পাঁচু বলল—পরীক্ষা করার কিছু নেই। আমি সুস্থ।

—ঠিক আছে। সেটা বুঝব আমি। এখন চটপট শুয়ে পড়ো।

ডাক্তারের ধমকে পাঁচু একটুও না ঘাবড়ে বলল, মেজাজ দেখাবেন না ডাক্তারবাবু। আপনার সবকিছু জানি আমি। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব···।

—কী জানিস রে? বাব্বা—এ তো দেখছি শেয়ানা পাগল!

—আপনি মহকুমা হাসপাতালের মাইনে-করা ডাক্তার। কিন্তু প্রায় কোনোদিনই ওই হাসপাতালে পাওয়া যায় না আপনাকে। ডিউটি আওয়ার্সে আপনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। হাসপাতাল-সুপারের সঙ্গে টাকার লেনদেন আছে আপনার। তাই দিনের পর দিন কাজ না করলেও মাসের শেষে মাইনের টাকাটা ঠিক পেয়ে যান।

উঠোনে উপস্থিত সবাই থম মেরে গেছে। ডাক্তারের মুখ লাল। হরেনের দিকে তাকিয়ে বলল —এটা কি পাগলামি? না বদমাইশি? গ্রামের এতগুলো লোকের সামনে আমাকে এভাবে অপমান করা? ননসেন্স···!

ডাক্তারের সমর্থনে অনেকেই হইচই করে ওঠে। তাতে বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে পাঁচু আবার বলতে শুরু করে—তাহলে আরো একটু শুনে যান, ডাক্তারবাবু। কয়েক মাস হল আপনি একটা নার্সিংহোম চালু করেছেন। হাসপাতালের লোকজনের সঙ্গে যড় করে আপনি সরকারি পয়সায় কেনা ওষুধ পাচার করে নিয়ে আসেন নার্সিংহোমে। তারপর সেই ওষুধ বিক্রি করেন রুগীদের কাছে। এ ছাড়াও অনেক বে-আইনি কাজ করা হয় নার্সিংহোমে। যেমন—পাঁচুর বলা শেষ হয় না। দুহাতে ভিড় সরিয়ে, নিজের মোটর-বাইকে উঠে বসে ডাক্তার। ইনজিনে স্টার্ট দিয়ে চেঁচিয়ে বলে—হরেন, আমি পাগলের ডাক্তার নই। ওর চিকিৎসা আমাকে দিয়ে হবে না। তাড়াতাড়ি ওকে রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা করো।···

ইতিমধ্যে পাঁচুর পাগলামির খবর ছড়িয়ে পড়েছে আরও। মজা দেখতে ভড় আরও বেড়েছে। তিল-ধারণের জায়গা নেই উঠোনে। খবর পেয়ে পঞ্চায়েত-প্রধান গোরাচাঁদ বাগও এসে হাজির। ভিড়ের মধ্যে হরেনকে খুঁজে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার হে? তোমাদের অঞ্চলে কোনো গণ্ডগোল লেগেছে? সুইসাইড করতে গিয়ে কে নাকি হাতেনাতে ধরা পড়েছে। তারপর থেকে শুধু ভুল বকছে? ভবতোষ ডাক্তারের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তাঁকেও পাগলটা যা-তা বলেছে। খুব অপমানিত হয়েছেন মনে হল।

—আর বলেন কেন? হরেন আক্ষেপের সুরে বলে। —পড়ে গিয়ে পাঁচু মাথায় একটা আঘাত পেয়েছে। তারপর থেকেই উলটোপালটা বকছে।

—কে পাঁচু? পঞ্চানন? কেশবচন্দ্র স্কুলের মাস্টার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অ। তা সে তো লেখাপড়া-জানা ছেলে। হঠাৎ এরকম উলটোপালটা বকছে কেন? চলো তো কেসটা একবার দেখি।

পাঁচু আগের মতোই ঝিম মেরে বসে ছিল। প্রধান তার কাছাকাছি গিয়ে বলল—কী ব্যাপার হে?

পঞ্চানন! কোনো অসুবিধে বোধ করছ?

—আজ্ঞে অসুবিধে তো সবটাই। চোখ তুলে বলল পাঁচু। —আপনি প্রধানসাহেব স্বয়ং আমাদের বাড়িতে হাজির! আপনি ব্যস্ত মানুষ। মিটিং-মিছিল নিয়ে পড়ে থাকেন। আমার যে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে।

—কী প্রশ্ন?

—আমি যে ইস্কুলে পড়াই, তার ধারে-কাছে একটাও টিউবওয়েল নেই। ছ-বছর ধরে দশ-বারোটা পিটিশান করা হয়েছে আপনাকে। কোনো ফল পাই নি।

আচমকা এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে প্রধান মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল—ওসব কথা এখন থাক। তা তুমি হঠাৎ ভোরবেলা চুপিচুপি গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিলে কেন? মরদ হয়ে লজ্জা করে না?

—গলায় দড়ি দিতে যাই কি সাধে? আপনাদের কাজ-কারবার দেখে বাঁচতে আর ইচ্ছে করে না।

—তাই নাকি হে? কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছ আজকাল?

—আজ্ঞে মেলামেশা করার সময় কোথায়? দিনরাত বই-কলেজ নিয়ে থাকি আর ছেলে পড়াই। প্রধানমশাই একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো। হাইওয়ের মুখ থেকে আমাদের গ্রাম অব্দি যে রাস্তাটার সংস্কার বাবদ দু-লাখ টাকা খরচ দেখিয়েছেন আপনি, সেই রাস্তায় কোনো কাজ কি আদৌ হয়েছে? এসটিমেটে আছে আশি হাজার টাকা মোরাম ছড়ানোর খরচ। কিন্তু মোরামের একটা ডেলাও আপনি দেখাতে পারবেন না রাস্তায়। শুধু একটু মাটির কাজ ছাড়া কিছুই হয় নি ওখানে। এর জন্যে দু-লাখ টাকা খরচ?

প্রধান যেন সত্যিই থতোমতো খেয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার। অবস্থা সামাল দিতে হরেন এগিয়ে এসে বলে—পাঁচু, এসব কী আরম্ভ করছ তুমি? যাকে যা নয় তাই বলে অপমান করছ? এসব কি পাগলামি না সত্যিই বজ্জাতি?

পাঁচু উত্তর দিল—সেসব বিচার পরে হবে, কাকা। তার আগে আমার আরও কিছু বলার আছে—সেগুলো শুনুন। গ্রামীণ পুনর্বাসন প্রকল্পে আমাদের প্রধানসাহেব ২০টা বাড়ি তৈরির জন্যে লাখখানেক টাকা খরচ দেখিয়েছেন। কিন্তু যেসব মৌজার নাম লিস্টে আছে, সেইসব মৌজায় গেলে একটা বাড়িও চোখে পড়বে না। শুধু কিছু বাঁশ আর খড় পড়ে আছে দেখবেন। এ ছাড়াও ওনার কীর্তি আরও শুনুন। চারটে পুকুর নতুন করে খনন করবেন বলে বিডিও অফিস থেকে টাকা তুলে উনি আসলে চারটে ডোবা থেকে মাটি আর পাঁক তুলে খরচ দেখিয়েছেন। কী, ঠিক বলছি আমি, প্রধানসাহেব?

—শুয়োরের বাচ্চা, তুই ভেবেছিসটা কী? আমার নামে এসব উলটোপালটা কথা রটাচ্ছিস এই গ্রামের এত লোকজনের সামনে? তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব......।

প্রধান এগিয়ে যায় পাঁচুর দিকে।

কিন্তু এ কী? পাঁচুও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রধানের মারমুখী মূর্তির মুখোমুখি হয়। বিকট এক হুঙ্কার ছেড়ে বলে—খবরদার! গায়ে হাত দিলে আপনাকেও সহজে ছেড়ে দেব না। এই নখ দিয়ে চোখ......! অবাক হয়ে সবাই তাকায় পাঁচুর দিকে। এ কী রূপ দেখছে তার! লিকলিকে, প্যাংলা শরীরের পাঁচুকে চেনাই যাচ্ছে না! চোখ-দুটো আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। প্রধানকে হয়তো ঘা-কতক কষিয়েই দেয় পাঁচু। বেগতিক দেখে হরেন এবং অন্যান্যরা এগিয়ে আসে। প্রধানকে শান্ত করে। পাঁচুকে দু-চারজন জাপটে ধরে।

—আচ্ছা, এ অপমানের শোধ আমি নেবই। প্রধান গজগজ করে। —পাগল না হাতি! বদমাশ কোথাকার! থানায় এফ. আই. আর. করব আমি ওর নামে! প্রধান আর দাঁড়ায় না। হনহন করে হাঁটতে শুরু করে। বোধহয় থানার দিকেই।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই থানাতেই পাঁচুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে প্রধান। কেননা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই থানার জীপে স্বয়ং বড়োবাবু এসে উপস্থিত ঘটনা-স্থলে। ইতিমধ্যে বেশ পাতলা হয়ে গিয়েছে ভিড়। হুড়মুড়িয়ে জীপ ঢুকতে দেখে আবার নতুন ক'রে লোকজন মজা দেখতে হাজির হল পাঁচুদের বাড়ির উঠোনে। হরেন হাত নেড়ে কীসব বোঝাচ্ছিল কয়েকজনকে। বড়োবাবুকে এগিয়ে আসতে দেখে বেশ শশব্যস্ত হয়ে নমস্কার করে বলল—আসুন স্যার, আসুন!

খুব গম্ভীরভাবে বড়োবাবু জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার হরেনবাবু? আপনার এই গ্রামে তো কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম ছিল না। কিন্তু এসব কী শুনছি? স্বয়ং প্রধানমশাই হন্তদন্ত অবস্থায় থানায় গিয়ে হাজির! পঞ্চানন গরাই নামে কে এক ছোকরা নাকি ওনার নামে যা-তা স্ক্যানডাল শুরু করেছে! আবার মারধরও করতে গেছে! কোথায় সে ছোকরা? একবার মুখটা দেখতে চাই তার···!

হরেন মৃদু গলায় বলতে চেষ্টা করে—পাঁচু ছেলেটা মোটেই খারাপ নয় স্যার—তবে ওর মাথাটা বোধ-হয় একটু বিগড়ে গেছে। প্রধানবাবুর সঙ্গে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে ও।

—মাথা বিগড়েছে? সে মাল গেল কোথায়? থানায় নিয়ে গিয়ে দু-চার ঘা দিলেই আবার মাথা ঠিক হয়ে যাবে। আমি দাঁড়াচ্ছি এখানে। ডাকুন পঞ্চাননকে—!

হরেন পাঁচুদের বাড়ির দিকে গিয়ে আবার খানিক পরে ফিরে আসে।

—স্যার,—মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলে হরেন।

—কী হল?

—সেই ভোর থেকেই তো প্রলাপ বকছে ছেলেটা। এখন ঝিমিয়ে পড়েছে একটু। ঘুমোচ্ছে।

—হুঁ, পুলিশ দেখলেই ঘুম পায়। একেবারে পাকা ক্রিমিন্যাল দেখছি। চলুন তো ওর বাড়িতে।

হরেন বড়োবাবুকে নিয়ে আসে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে। বড়োবাবু বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়ে—পঞ্চানন, বাইরে বেরিয়ে এসো—আমি থানার বড়োবাবু বলছি। পাঁচুর মা একহাত ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এসে উত্তর করে—ছেলে আমার অসুস্থ, বাবা। একটু ঘুমোচ্ছে।

—ওসব ঘুম-টুম পরে হবে। এখুনি ছেলেকে বের করে দিন। না হলে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকব।

ঠিক এই মুহূর্তেই পাঁচু নিজেই বাইরে বেরিয়ে এসে বলে—কী ব্যাপার, বড়োবাবু? ভরদুপুরে এসে অত মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন? আমি চোর না ডাকাত? চোর-ডাকাত ধরতে অবশ্য এত তৎপরতা দেখি না আপনার।

—পঞ্চানন, সমঝে কথা বলবে! তোমার নামে ওয়ারেনট আছে। তুমি জনপ্রতিনিধিকে মারধর করতে গেছ।

—তাই নাকি? তাহলে আমাকে অ্যারেস্ট করবেন? কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। রতনপুরের সুশীল বেরাকে আপনি এখনও অ্যারেস্ট করেন নি কেন?

—কে সুশীল বেরা? বড়োবাবুর গলা যেন হঠাৎ একটু মিইয়ে যায়।

—সুশীল বেরাকে চেনেন না? একচেটিয়া হোলসেল ডীলার। যার পুকুরে আপনি প্রায়ই ছিপ ফেলতে যান।

বড়োবাবুর মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায়। উপস্থিত জনতার মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। সম্প্রতি সুশীল বেরার বাড়িতে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। তার একমাত্র ছেলের বউ হঠাৎ শাড়িতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা

করেছে। কিন্তু অনেকেই বলাবলি করছে, দেনাপাওনা নিয়ে নাকি মেয়ের বাপের বাড়ির সঙ্গে সুশীলের প্রথম থেকেই একটা বিরোধ ছিল। দুর্ঘটনার সময়ে সুশীলের ছেলে বাড়িতে ছিল না। লোকের সন্দেহ সুশীল নিজেই বউটার শরীরে কেরোসিন ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মেরেছে।

—কী ব্যাপার, চুপ মেরে গেলেন কেন? বলুন! আসল ঘটনা কী ছিল আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছি। সুশীল আর তার স্ত্রী কচি বউটাকে পুড়িয়ে মেরেছে। মেয়েটার মৃত্যুর পর ওর বাবা থানায় আপনার সঙ্গে দেখা করে অনেক চিঠিপত্র দেখিয়েছে। সেসব চিঠিতে লেখা ছিল শ্বশুরবাড়ির অমানুষিক অত্যাচারের কথা। এরকম আশঙ্কার কথাও লেখা ছিল যে, শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাতে তার প্রাণহানিও ঘটতে পারে। এসব চিঠি আপনার কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি সেসব কোর্টে পেশ করেন নি। বরং কেসটা এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে মনে হয়, ওটা আত্মহত্যারই কেস—।

—পঞ্চানন, এসব কী বলছ তুমি? চেঁচিয়ে ওঠে বড়োবাবু।

পাঁচু তা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে বলে—ঠিকই বলছি। আমি সব জানতে পেরেছি। সুশীল দশ হাজার টাকা দিয়ে আপনার মুখ বন্ধ করেছে।

—পঞ্চানন, যা-তা বলবে না আমার নামে! চলো, গাড়িতে ওঠো। আমি অ্যারেস্ট করলাম তোমাকে!

ভিড়ের মধ্যে যারা দাঁড়িয়েছিল, বড়োবাবুর এই জুলুমে তারাও যেন হঠাৎ খেপে যায়। অনেকেই চেঁচিয়ে বলে—না বড়োবাবু, পাঁচুকে আপনি এভাবে অ্যারেস্ট করতে পারবেন না। ওর কথার জবাব দিন। কেন সুশীল বেরার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাকে আপনি অ্যারেস্ট করেন নি? জবাব দিন! জবাব দিন! জবাব দিন! —কানে যেন তালা ধরে যায় বড়োবাবুর। জনতা এখন বেশ ক্ষিপ্ত এবং উত্তেজিত। বড়োবাবু এক মুহূর্ত ভেবে নেয়। এদের সামনে দিয়ে পাঁচুকে কিছুতেই থানায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। আস্তে-আস্তে পেছু হঠতে থাকে বড়োবাবু। তারপর জীপে উঠলে ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেয়। ধুলো উড়িয়ে জীপ চলতে শুরু করে। আর সেদিকে আঙুল দেখিয়ে পাঁচু এবার সত্যিই পাগলের মতো হাসতে শুরু করে—পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! সত্যের মুখোমুখি হবার সাহস নেই বড়োবাবুর! ভয়ে পালাচ্ছে···হি···হি···হি···হি!

মাঝরাতে কালো গাড়ি

গভীর রাত। মানুষ কেন, একটা পোকামাকড়ও বোধহয় জেগে নেই। অন্ধকারে, নৈঃশব্দ্য কাঁপিয়ে একটা কালো ভ্যান এসে থেমে যায় পাঁচুদের বাড়ির ঠিক সামনে। ছ-সাতজন সেই ভ্যান থেকে ঝপাঝপ লাফিয়ে নামে। একজন কড়া নাড়তে শুরু করে বন্ধ দরজায়। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর পাঁচুর মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করে —কে?

—দরজা খুলুন!

—কে তোমরা?

—আমরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আপনার ছেলেকে হাসপাতালে যেতে হবে।

—না, আমার ছেলে হাসপাতাল যাবে না!

—কেন যাবে না? আপনার ছেলে তো পাগল!

—না। পাগল নয়। আমি ওর মা। আমি জানি —আমার ছেলে পাগল নয়।

—দরজা খুলুন। নাহলে দরজা ভাঙব আমরা! ভারী বুটের কয়েকটা আঘাত এসে পড়ে দরজায়। পলকা কাঠের দরজা কেঁপে ওঠে। এই বুঝি ভেঙে পড়ে দরজা! মা পাঁচুর দিকে তাকায়। কোনো সাড় নেই। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। সারাদিন বড়ো ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে। আবার দরজায় তিন-চারটে লাথি! এবার না খুললে সত্যিই ভেঙে যাবে দরজাটা! অসহায় পাঁচুর মা দরজা খুলতে বাধ্য হয়। সামনে অনেকে দাঁড়িয়ে। আবছা আঁধারে মুখ দেখা যায় না কারোরই।

—ওকে নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা! পাঁচুর মা দরজা আগলে দাঁড়ায়।

—সর না রে, বুড়ি! একজন ধাক্কা দিলে একপাশে ছিটকে পড়ে যায় পাঁচুর মা। তিনজন ঘরে ঢুকে পাঁজাকোলা করে ঘুমন্ত পাঁচুকে তুলে নিয়ে যায়।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা ওকে?

—বললুম তো হাসপাতালে। ওর চিকিৎসা দরকার।

—হাসপাতাল নয়। আমরা ওকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি। আর-একজন বলে। আর সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

ভ্যানের মধ্যে পাঁচুকে তুলে নিয়েছে ওরা। পাঁচুর মা একবার আর্ত স্বরে চেঁচাতে থাকে—কে কোথায় আছ, বাঁচাও! আমার ছেলেকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে এরা! কে কোথায় আছ···এসো।

কিন্তু চলন্ত ভ্যানের ইনজিনের শব্দে সেই চিৎকার চাপা পড়ে যায়। একরাশ ধুলো উড়িয়ে ভ্যানটা তীব্র গতিতে ছুটতে থাকে। পেছনের লাল আলো ক্রমশ বিন্দু হতে-হতে মিলিয়ে যায়···।

নিজ ধর্মের মানুষের প্রতিও বিদ্বেষের ঐতিহ্য বহন করে প্রতিটি ধর্ম

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

অবিভক্ত ভারতবর্ষ। পরাধীন ভারতবর্ষ। পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় ঈশ্বরদি নামে একটি বড়ো জংশান স্টেশন। সেখান থেকে একটি রেললাইন চলে গিয়েছে সিরাজগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত। মাঝখানে একটি ছোটো স্টেশন,—নাম ভাঙ্গুরা। এই স্টেশন থেকে মাইল তিনেক হাঁটা পথে গেলে সুজাপাড়া গ্রাম। অজগাঁ। রয়েছে গোয়ালাপাড়া, মুসলমানপাড়া আর উচ্চবর্ণের পাড়া। অন্য কোথাও হয় কিনা জানি না, ঐ গাঁয়ে একটি লৌকিক দেবীকে ঘিরে এক আশ্চর্য পরব হত। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে হত সেই পুজো। মেয়েরা করতেন সেই দেবীর আরাধনা। মাটির মূর্তি গড়ে, গৃহস্থের অতি সাধারণ কামনা-বাসনা জানিয়ে দিনের শেষে পুজো শেষ হত। নিজেদের সৃষ্ট পাঁচালী পড়ে পুজোর সমাপ্তি ঘটানো হত। কিন্তু এর পরের অনুষ্ঠানটি বড়ো পবিত্র, বড়ো বিচিত্র। প্রসাদ প্রথম গ্রহণ করবেন একজন মুসলমান, তিনি প্রসাদ খাওয়ার পরেই পুজো সমাপ্ত হবে, এবং অন্য সবাই প্রসাদ পাবেন। মুসলমানপাড়া থেকে ছেলে-মেয়ে-বউরা আসতেন, বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেবীকে প্রণাম করে প্রসাদ নিতেন, তারপরে অন্যেরা প্রসাদ খেয়ে পুকুরে গিয়ে দেবীকে বিসর্জন দিতেন। প্রথম প্রসাদ-ভক্ষণকারী মুসলমান থেকে সবাই দেবীবিসর্জনের মিছিলে থাকতেন। এই সংহতি আরোপিত নয়, সহজ পথে গড়ে উঠেছিল এই মানসিকতা।

দেশ স্বাধীন হল, তবু দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলতে লাগল। দেশবিভাগের পাঁচ মাস পরের কথা। ততদিনে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবিক-মানসিক ব্যবধানও বেড়ে চলেছে। বাবা থাকেন তখন ঈশ্বরদিতে। অধিকাংশ হিন্দু পরিবার তখন অপশান দিয়ে হিন্দুস্থানে চলে এসেছেন। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ কিছু দূরে পাকসিতে দাঙ্গা শুধু হয়েছে বলে খবর এল। আমাদের বাড়ির পাশেই থাকেন একজন গার্ড, আকবর তালুকদার,—বাবার বিশেষ বন্ধু। তাঁর দুই মেয়ে মায়া আর কোহিনুর আমার সমবয়সী। তিনি এসে বাবাকে বললেন, আজ রাতে সবাই আমাদের বাড়িতে থাকবেন। বাইরের অনেক লোক শহরে এসেছে, কখন কী হয় বলা যায় না। পরে যে কয়েকদিন সেখানে আমরা ছিলাম, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা আমাদের আগলে রাখতেন। আসবার সময়ে স্টেশনে অনেকের ভেজা চোখ দেখেছি, মায়ের হাত ধরে সশব্দে মেয়েদের কাঁদতে দেখেছি।

পঞ্চাশ সালের কথা। উভয় দেশেই আবার রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃহত্যা ঘটে গেল। একদিন থেমেও গেল উত্তেজনা। কুষ্টিয়ার থানাপাড়ায় থাকতেন দ্বিজপদ ভৌমিক। অতি সজ্জন মানুষ। পাশেই থাকতেন একজন রিটায়ার্ড গার্ড, হৃষীকেশ বিশ্বাস। তাঁর জমিজমা দেখতেন অরেজ মিয়া। তিনি আবার কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলেও কাজ করতেন। ভৌমিক পরিবার চলে এসেছেন ভারতে। খবর পাওয়া গেল, তাঁর বড়ো ছেলে দারোগা হয়েছেন। যেদিন অরেজ মিয়াঁ শুনলেন এই খবর,—তিনি বললেন, গার্ড সাহেব, খুব খুশির খবর, নান্নু দারোগা হয়েছে। তাহলে নান্নু তখন আমাদের জগতি গাঁয়ে চলে আসুক। বড়ো ভালো ছেলে। আর এহন যে দারোগা আছে, মকবুল কিত্রিয়া বড়ো পাজি লোক, দয়ামায়া নাই। নান্নুরে লিখেছেন, চলে আসুক।

তিন বছর আগেই দ্বিজাতিতত্ত্বের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হয়েছে। সাধারণ নিরক্ষর মানুষ অরেজ সেই বিভাজন হয়তো ওপর-ওপর জানেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাকে কলুষিত করতে পারে নি। লৌকিক মন তাঁকে অন্যভাবে ভাবাচ্ছে, তিনি নিরাপত্তা চাইছেন, ভালোমানুষ মানুষকে চাইছেন, মকবুল কিত্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি চাইছেন।

বয়স্ক মানুষদের মুখে এরকম হাজারো ভালো-লাগা সত্য ঘটনা আমরা শুনতে পাব। এই ভালো-লাগার সত্য ঘটনা শুধু অতীতেই ছিল না, আজও আছে। বহরমপুরের কাটরা মসজিদের চারপাশে, মালদা-মিরাট-ভাগলপুর-জামশেদপুর-রাঁচির চার-পাশের করুণ ঘটনাবলীর পাশাপাশি আজও সুজাপাড়া-ঈশ্বরদি কিংবা কুষ্টিয়ার সুস্থ মানসিকতারও হদিস পাওয়া যাবে। তবে এগুলো সবই ব্যতিক্রম। অনেক দৃষ্টান্ত থাকলেও ব্যতিক্রম। ভারতীয় সমাজ দার্শনিক ও তত্ত্বগত চিন্তায় যতই মহান ভাবনার প্রকাশ করে থাকুন না কেন, বাস্তব অবস্থায় মনুষ্যত্বের যে ধারাবাহিক অবমাননা ঘটিয়ে চলেছেন হাজার-হাজার বছর ধরে, তার তুলনা বিরল। বিভেদের মধ্যে ঐক্য—এই বিষয়টি বাস্তব ইতিহাসে প্রায় অদৃশ্য। যে সংহতির কথা আমরা বলি, তা সংহতি নয়, এক ধরনের ভীতিপ্রদ সমাজে মাথা নত করে সবকিছু সহ্য করবার এক দর্শন। সমাজে-সমাজে যোগাযোগের অভাবের জন্য, আপন-আপন খোলসে আবৃত থাকবার অভ্যাসে সমাজচালকেরা এই সংহতির মিথ প্রচার করেছিলেন। বিভেদ শুধু হিন্দু-বৌদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-শিখ প্রভৃতির মধ্যে নয়। এরা সকলেই ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত বলেই বিভেদের জাল আজকে সর্ব-ব্যাপ্ত হতে পেরেছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ-অনৈক্য রয়েছে, তার কথা আমরা বড়ো বেশি করে বলি, ভারতীয় সমস্ত ধর্মের মধ্যে যে বীভৎস ঈর্ষা ও হানাহানির মনোভাব রয়েছে, একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে যে অমানবিক কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে, তাকে উপেক্ষা করলে সম্প্রদায়গত বিভেদের পুরো ছবি আমরা পাব না, কিংবা এর বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের সঠিক পথও খুঁজে পাব না।

ভারতীয় দর্শনে এমন একটি বাক্য খ্রীষ্টপূর্ব যুগে প্রাচীন সভ্যতায় উচ্চারিত হয়েছিল যার থেকে পবিত্র, মানবিক, অনন্য ও অবিস্মরণীয় বাক্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,—এই বিশ্বে আমরা সকলে অমৃতের পুত্র। ধর্ম নয়, গোষ্ঠী নয়, বর্ণ নয়, দেশ নয়, সম্প্রদায় নয়,—মানুষের পরিচয় মানুষ হিসেবে। আন্তর্জাতিক মানসিকতার এমন অপরূপ অভিধা দুর্লভ। হ্যাঁ, এই দর্শন অতুলনীয়, কিন্তু ভারতীয় সমাজে বাস্তবক্ষেত্রে কোনো কালে এর প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই নি। যুক্তির খাতিরে তর্কের ভিত্তিতে বলা যায় ভারতের প্রাচীন যুগে এই উপলব্ধি সত্য ছিল, বাস্তব ছিল,—কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের সমাজের অবক্ষয়ের দরুন এই সত্য পরবর্তী কালে পরিত্যক্ত হয়। এই যুক্তির সত্যিই কি কোনো ভিত্তি আছে?

রামায়ণের দৃষ্টান্ত দিতে হচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব কালে রচিত অতি প্রাচীন মহাকাব্য বলেই নয়, আজকে যখন 'জাতীয় বীরের' জয়মাথায় বহু-বহু মানুষের হৃদয় মথিত, তখন রামায়ণের দৃষ্টান্ত দেওয়াই বোধহয় সঠিক। এই বিশ্বে আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র,—যেকালে এই দর্শন প্রচার করা হয়েছিল সেই যুগেই রামায়ণেরও সৃষ্টি। মানুষকে কী চোখে সেদিন প্রজা-পালক সম্রাট দেখতেন, তার কিছু নমুনা আমরা রামায়ণে পাই। কাহিনীটির সামান্য অংশই লোকে বলেন, কিন্তু এর অমানবিক বিষয়সমূহ যে কত গভীর —তা উপলব্ধি করবার জন্য বিস্তৃতভাবে কাহিনীটি উদ্ধৃত করছি।

এই কাহিনী রয়েছে বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম সর্গ থেকে ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ পর্যন্ত।

একদা কোনো এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালককে নিয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রস্নেহে ও দুঃখে কাতর হয়ে বারবার হা পুত্র হা পুত্র বলে রোদন করতে লাগলেন,—আজ কোন্ দুষ্কর্মের ফলে আমার এই বালকপুত্র পিতৃকার্য না করে মৃত্যুমুখে পতিত হল। রাজা রামের রাজ্যে কারও যে অসময়ে মৃত্যু হয়, আমি তা কখনও দেখি নি, শুনি নি। কিন্তু যখন তাঁর রাজ্যে বালকের মৃত্যু হল তখন নিঃসন্দেহে তাঁরই কোনো ঘোর পাপ আছে। অন্য রাজার অধিকারে বালকের এইরূপ ঘটে না। রাম। এই বালক কালগ্রাসে পতিত, তুমি একে জীবিত করো। আমরা এযাবৎকাল পর্যন্ত তোমার রাজ্যে সুখে ছিলাম, কিন্তু এখন আমরা মৃত্যুর বশবর্তী, সুতরাং এখন তোমার রাজ্যে আমাদের সামান্যই সুখ। এই রাজ্য নিশ্চয় অরাজক। রাজা অসচ্চরিত্র হলে প্রজার অকালমৃত্যু হয়। অথবা বোধহয় গ্রাম ও নগরের অধিবাসীরা নানারূপ পাপ আচরণ করছে এবং সেই-সমস্ত পাপের যথোচিত প্রতিবিধানও হচ্ছে না। গ্রাম ও নগরে যে পাপের প্রতিবিধান হচ্ছে না, তাও নিশ্চয়ই রাজদোষ। সেই রাজদোষেই আজ আমার বালকপুত্র বিনষ্ট হয়েছে।

জনপদবাসী ব্রাহ্মণ এইভাবে বারবার রামকে ভর্ৎসনা করে দুঃখিত মনে মৃত বালককে নিয়ে রাজদ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাম ব্রাহ্মণের এই সকরুণ বিলাপ শুনতে পেলেন এবং অতিমাত্র দুঃখিত হলেন। রাম ঋষি বশিষ্ঠ মার্কণ্ডেয় গৌতম মৌদ্‌গল্য বামদেব কাশ্যপ কাত্যায়ন জাবালি নারদ ও ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা বলুন কেন এই বালকের অকালমৃত্যু হল?

নারদ বললেন, রাজন্, যে কারণে এই বিপ্রবালক অকালে বিনষ্ট হয়েছে বলি, শুনে যা কর্তব্য হয় করবে। সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করতেন। অন্য জাতির সে বিষয়ে কখনও অধিকার ছিল না। ঐ সত্যযুগে তপস্যার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রধান এবং লোকসকল অজ্ঞানতার আবরণশূন্য। অকালমৃত্যু কাউকে স্পর্শ করত না এবং সকলেই দীর্ঘদর্শী ছিল। সত্যের পর ত্রেতাযুগ। এই সময়ে মানুষের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হয়ে যায়, তাই দেহে আত্মাভিমান ও ক্ষত্রিয়ের জন্ম। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়েরও তপস্যায় অধিকার জন্মে। তারপর দ্বাপর যুগের উৎপত্তিতে বৈশ্যারাও তপস্যার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এই তিন যুগে তপস্যায় শূদ্রের কোনো অধিকার নেই। এই নীচ বর্ণ ভবিষ্যতে ঘোরতর তপস্যা করবে। তুমি সমস্ত দেশ অনুসন্ধান করো। যেখানে দুষ্কর্ম দেখবে তার দমনে চেষ্টা করো। তা করলে তোমার ধর্মবৃদ্ধি ও মানুষের আয়ুবৃদ্ধি হবে এবং এই বিপ্রকুমারও পুনরায় জীবন লাভ করবে।

রাম পুষ্পকে আরোহণ করে এদিক-ওদিক ঘুরে পশ্চিমমুখে চললেন। সেদিকে কোনো দুষ্কার্য দেখতে না পেয়ে হিমাদ্রিপ্রবিষ্টিত উত্তরদিকে এবং সেখান থেকে পূর্বদিকে গেলেন। দেখলেন, ওইদিক নিষ্পাপ, আচার পরিশুদ্ধ। পরে তিনি দক্ষিণদিকে উপস্থিত হলেন এবং দেখলেন, শৈবল পর্বতের উত্তরপাশে একটি সুপ্রশস্ত সরোবরের তীরে কোনো এক তাপস বৃক্ষে লম্বমান হয়ে আছেন এবং তিনি অধোমুখে অতি কঠোর তপস্যা করছেন।

রাম তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, তাপস! তুমি ধন্য। বলো, তুমি কোন্ যোনিতে জন্মেছ। আমি রাজা দশরথের পুত্র রাম। তুমি ব্রাহ্মণ না দুর্জয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র? সত্য বলবে।

তাপস বললেন, রাজন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মেছি। এইরূপ কঠোর তপস্যা দ্বারা সশরীরে দেবত্বলাভ করা আমার ইচ্ছা। যখন আমার দেবত্বলাভের ইচ্ছা তখন নিশ্চয় জেনো, আমি মিথ্যা কথা বলছি না। আমি শূদ্রজাতি, আমার নাম শম্বুক।

তাপস এই কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে রাম দিব্য-দর্শন খড়্গ নিষ্কোষিত করে তার শিরশ্ছেদন করলেন।

শূদ্র শম্বুক নিহত হলে দেবগণ বারবার রামকে সাধুবাদ দিতে লাগলেন, রাম, তুমি দেবগণের প্রিয়-কার্য সাধন করলে। এই শূদ্র তোমারই জন্য দেবত্ব-লাভ করতে পারল না। এ আমাদের পরম সন্তোষ।

রামায়ণের এই কাহিনী বিশ্লেষণ করলে সম্প্রদায়-গত অনৈক্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারব।

রামায়ণের কালে হিন্দুধর্ম অভিধাটি ব্যবহৃত হয় নি, তবে যে নামেই তাকে ডাকা হোক, বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক এই ধর্ম হিন্দুধর্মই। শম্বুকের কাহিনীর সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি: ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য তপস্যার অধিকারী। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণ করায় তাই তারা অধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হল। অন্য একটি কারণও রয়েছে, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ও সৈন্যকে সমীহ না করলে সমূহ বিপদ। মহর্ষি অগস্ত্যের স্তাবকতার মধ্যে এর পরিচয় রয়েছে,—রাম, তুমি আমার ভাগ্যবলে উপস্থিত। তুমি আমার মাননীয় ও পূজনীয়। দেবতাদিগের কাছে শুনলাম তুমি শূদ্র তাপসকে বিনাশ করে এসেছ। তুমি শ্রীমান নারায়ণ। তুমি সকল দেবতার প্রভু এবং নিত্য পুরুষ।

আর বৈশ্য? তাঁরা রামায়ণের যুগে কৃষিকাজ করতেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্র কৃষিপ্রযুক্তির কিছু জানতেন না। রাজার শস্যভাণ্ডারকে যাঁরা শ্রমশক্তিতে পূর্ণ করে তুলছেন, তাঁদের দাবিকে স্বার্থের খাতিরেই স্বীকার করে নিতে হয়। অর্থাৎ, যে সম্প্রদায়কে প্রয়োজন কম তার প্রতি ক্রেতায় ও বিদ্বেষপ্রচারে সে যুগ পারঙ্গম ছিল। রাম যে শূদ্রের প্রতি আচরণ করেছেন সেটা স্বাভাবিক, তিনি কোনো 'সামাজিক অন্যায়' করেন নি। সেই কালের নিয়ম তিনি রক্ষা করেছেন। এই বিভেদপন্থী মানসিকতাই আমাদের ঐতিহ্য, আজও আমরা তা বহন করে চলেছি। একই ধর্মের একটি গোষ্ঠীর প্রতি আমরা আবহমান কাল ধরে যে অমানবিক অবিচার-অত্যাচার করে চলেছি তাতে ভিন্নধর্মের মানুষের প্রতি কী ধরনের আচরণ স্বাভাবিক, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রাচীন ধর্মসূত্র আর স্মৃতিগ্রন্থে চার বর্ণের কাঠামোয় সমস্ত ভারতীয় সমাজকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। বর্ণপ্রথা একটি মিথ, কিন্তু আজও বৃহত্তর হিন্দু ভারতীয় সমাজ এই কাঠামোয় আবদ্ধ রয়েছে যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সম্প্রদায়গত বিভেদও সমানভাবে বর্তমান। কালের বিবর্তনে বহিরঙ্গ রূপের কিছু পরিবর্তন তো ঘটবেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মানসিকতার অঙ্কুর সমান সতেজ রয়েছে।

চার বর্ণের এই বিভাজনে ভারতীয় সমাজে যে প্রথা প্রচলিত হয়ে বিষবৃক্ষ হিসেবে দেখা দিল, তা আরও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল। সাধারণের ধারণা রয়েছে যে, উচ্চবর্ণের মানুষেরাই শুধু নিম্নবর্ণের মানুষদের ঘৃণা করেন। তথ্যটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে ভরা। গ্রাম সম্পর্কে যাঁদের সমীক্ষা-ভিত্তিক অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা জানেন, উচ্চবর্ণের কাছে অচ্ছুত-জল-অচল মানুষের মধ্যেও কী বীভৎস জাতিভেদপ্রথা বর্তমান অচল। সমশ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক এই বিভেদচিন্তা উচ্চবর্ণের-নিম্নবর্ণের বিভেদের চেয়েও হাজারগুণ বিদ্বেষপ্রসূত। দুজনেই অন্যদের দ্বারা ঘৃণিত, কিন্তু উভয়ের মধ্যেকার ঘৃণা আরও সক্রিয়। সংহতির এই অভাব ভারতীয় সমাজে সমস্ত রকম বিষময় পরিবেশের স্রষ্টা। বর্ণপ্রথার মতো অলীক ও অনৈতিহাসিক একটি বিষয় যে ভারতীয় সমাজে কত গভীর ও ব্যাপক, তা অনুধাবন করলে সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির মূল রহস্য, হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রভৃতির মধ্যে মানসিক বিভেদের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

আবার, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সংঘর্ষের পাশাপাশি সহযোগিতার মনোভাবও যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এ এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। ঐক্য-ভাবনা যেমন কার্যকর ছিল, তেমনি বিভেদের বিষবাষ্পও বিচিত্রগামী ছিল। বিশেষ-বিশেষ সময়ে এক-একটি মানসিকতা প্রবল হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক বিভেদ, মানুষের প্রতি অবমাননা এবং ধর্মীয় আচারসর্বস্বতা যখন হিন্দুধর্মকে গ্রাস করল, তখন বৌদ্ধধর্মের উদার মনোভাব ও সহজ পথ ভারতবর্ষের মানুষকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করল। দক্ষিণ-ভারত বাদে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের শান্ত ছায়ায় শান্তি খুঁজে পেল। রাজার ধর্ম প্রজা গ্রহণ করল। কিন্তু এই উত্তরণের পথে তেমন কোনো হানাহানি ঘটে নি। সহযোগের পথেই ধর্ম এগিয়েছিল। কিন্তু আদি শঙ্করাচার্য যখন আবার এঁদের পুরনো হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনবার সংগ্রাম শুরু করলেন, দেখা দিল সংঘর্ষ। রক্তক্ষয় ঘটল। পুরনো বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল।

গ্রাম-সমাজ তত গতিশীল ছিল না বলেই শত-শত বছর অবমাননকর পরিস্থিতির মধ্যেও এক ধরনের স্থিতাবস্থা বজায় ছিল।

যেমন ধরা যাক, সাত শ বছরের মুসলমান শাসন - কালের কথা। খ্রীষ্টান এবং মুসলমান বিজেতাদের একটি প্রবণতা ছিল,—বিজিত দেশকে স্বধর্মের আওতায় আনা। আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ ও আরব ভূখণ্ড তার প্রমাণ। কিন্তু ভারতবর্ষে এরা ধর্মীয় রূপান্তরের জন্য তেমন কোনো সর্বব্যাপী প্রয়াস চালান নি। জোর-জুলুম হয় নি তা নয়, কিন্তু তা আঞ্চলিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সমন্বয়ী মন বেশি সক্রিয় ছিল। তা না হলে, এত দীর্ঘদিনের শাসনের পরেও দেশে অধিকাংশ মানুষই পুরনো ধর্মের আওতায় রইলেন কী করে? আর দেশে সব শাসকই মুসলমান ছিলেন না, হিন্দু শাসকের অবস্থানও দিল্লি মেনে নিয়েছিল। আবার সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দিল্লির মুসলমান শাসনকর্তাদের বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও তার আশেপাশের সকলে তো ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হন নি। তাই জোর করে ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল —এটা কোনো যুক্তি নয়। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান শাসনকর্তাদের অনেকেই ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সক্রিয় বিরোধিতা করেছেন। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক অন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

এই কালের সাহিত্যে আমরা সংঘর্ষ কিংবা সাম্প্রদায়িক হানাহানির তেমন কোনো ব্যাপক পরিচয় পাই না। যদি বাস্তবে ঘটে থাকত, তবে তার প্রতিফলন সাহিত্যেও পাওয়া যেত। আসলে দুই বিদেশী শাসনকর্তারা ভারতের সামাজিক জীবনের ওপরে তেমন কোনো হস্তক্ষেপ করতে চান নি। এক্ষেত্রে তাঁদের উদারতাকে সাধুবাদ দিতেই হবে। হুশেন শা নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের ওপরে অত্যাচার করেছিলেন,—এ কথা প্রচার করা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অত্যাচারের কারণ ধর্মীয় নয়—সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আবার দেখতে পাই, গৌড়ের অধিপতি হুশেন শা হরিদাসের মুসলমান ধর্ম ত্যাগের জন্য বিচার করেন। বিচার-সভায় হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের সপক্ষে যে যুক্তি দেন, তাতে বাদশাহ ও সভার অন্যান্য মুসলমান ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

> শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর।
> নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
> পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে।
> হরিদাস ঠাকুরের যুকতা বচন।
> শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন।

ধর্মনিরপেক্ষতার যে মূল কথা টলারেন্স বা সহনশীলতা, সেই উপলব্ধি সমাজে প্রচলিত ছিল বলেই বাস্তবে ও সাহিত্যে এর প্রতিফলন দেখতে পাই।

ভারতীয় ঐতিহ্যের সহনশীলতা এবং বিধর্মী বিদেশীদের তারই অনুগমনের ফলে হিন্দুধর্মের তরফে কোনো ভয় ছিল না। মধ্যযুগে অনেক সংস্কার-আন্দোলন হল, ধর্মের কিছু মানবিক বিকাশও ঘটল, কিন্তু তাতে মূল হিন্দুধর্মের তেমন কোনো হেরফের ঘটল না। হিন্দুদের দর্শন হিন: কাউকে হিন্দু করা যায় না, হিন্দু হয়ে জন্মাতে হয়। চার আশ্রমের বাইরে

অসংখ্য গোষ্ঠী, কোম, বর্ণ, জন ছিলেন, এঁদের মধ্যেও ছিল স্তর-উপস্তর,—তবু সবাই হিন্দু। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দেবতার আরাধনার রূপ ছিল মোটামুটি হিন্দুধর্মীয়, তাই সকলেই হিন্দু। এই জোরের বশেই হাজার দুয়েক বছর ধরে হিন্দুরা নিজ সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার চালাতে পেরেছে।

এই দীর্ঘদিনের সামাজিক পরিমণ্ডলে আর কিছু থাকুক না থাকুক, অন্তত রাজনীতি ছিল না। যেদিন থেকে সমাজে স্বাভাবিক কারণেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে রাজনীতি প্রবেশ করল, সেদিন থেকেই প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গ্রাস করল মানুষের মনকে। হিন্দুদের মধ্যে এই বিদ্বেষ আগে থেকেই ছিল, হিন্দু থেকে যাঁরা মুসলমান হলেন সেই 'নীচ অন্ত্যজ জল-অচল' মানুষদের প্রতিও এই কুৎসিত ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই এক তরফের বিদ্বেষ অন্য তরফের বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলল। হিন্দুদের সাধনা হল আরও কিভাবে গোঁড়া হিন্দু হওয়া যায়, মুসলমানের সাধনা হল আরও কিভাবে ইসলামপন্থী হওয়া যায়; ইদানীং শিখদেরও সেই সাধনায় রত হতে দেখছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে, যে বিরোধ আজ সুস্থ মনুষ্যত্ব ও স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তার বয়েস হয়তো ষাট-সত্তর বছর, কিন্তু প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই নিজ ধর্মের মানুষদের প্রতি বিদ্বেষের যে ঐতিহ্য লুকিয়ে রয়েছে, তা অনুভবে না এলে সমস্যা উপলব্ধি করা যাবে না। হিন্দুদের ধর্মের বিভেদগুলি যেমন, তেমনি রয়েছে ইসলাম ধর্মে। ইসলাম ধর্মে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেখানেও রয়েছে ভেদপ্রথা এবং তা বোধহয় হিন্দুদের চেয়ে খুব কম নয়। আমরা শিয়া-সুন্নির কথা জানি, কিন্তু এহ বাহ্য, শতধাবিভক্ত গোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে সেই ধর্মে। এই বিভেদ রয়েছে শিখ ধর্মে, বৈষ্ণব ধর্মে, শাক্ত ধর্মে। ভারতীয় সমাজের এই ধর্মীয় বিভাজনই মূলত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উৎস।

মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের উল্লেখ করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—'আমাদের ভাষায় বলতে গেলে মোগল-পাঠান-সৈয়দরা সব ছিল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর জোলা-পোনারা সব ছিল শূদ্র। মুসলমান-দের এই জাতিভেদ অনেকের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে। এমনকী, কোনো-কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে হিন্দুধর্মের প্রভাবে মুসলমানদের ভিতর এই জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যেসকল হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছিল, কিন্তু নিজের-নিজের জাতব্যবসা ছাড়ে নি, ফলে জাতও ছাড়ে নি। তাতেই হিন্দুর অনুরূপ জাত মুসলমানদের মধ্যেও আছে।'

এই দ্বন্দ্বনৈরিতা ঐতিহ্যে রয়েছে বলেই আজ দেখতে পাচ্ছি, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হরিজন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারে; এই সেদিন নবম লোকসভার নির্বাচনে বিহারের আরা কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে হিন্দু ভূমিসেনারা ২৫ জন হরিজনকে গুলি করে হত্যা করল। মুর্শিদাবাদে মুসলমান চাঁই সম্প্রদায় ইসলামবিরোধী গান-বাজনা করেন বলে নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা তাঁদের ঘরবাড়িজ্বালিয়ে দেন, প্রহার করেন, হত্যা করেন। নিরংকারীরা প্রকৃত শিখ নন বলে প্রকৃত শিখের হাতে নিহত হন। এসব দৃষ্টান্ত আজ সকলেরই জানা।

কেন এমনটা ঘটল? এককথায় বলা যায়, উদারতার অভাব এবং সংকীর্ণতার প্রভাব। মোগল শাসনের পরবর্তী কালে আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এল। তারপরে আমরা পেলাম পাশ্চাত্য শিক্ষা। বিদেশী এই শাসকদের হাজারো ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু এরাই আমাদের হাজার বছরের তমসা ও কুশিক্ষা থেকে উদ্ধার করেছিল। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানচেতনা, জাতীয়তাবোধ, ইতিহাস-সচেতনতা এদেরই দান। অথচ এদের সময় থেকেই আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শতগুণ বেড়ে

চলল। অনেকে বলেন, ইংরেজরাই দুই ধর্মের মানুষদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলল। আমি বিশ্বাস করি না এই তত্ত্ব। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ বাধাবে বাইরের কেউ, আর দুই ভাইয়ের মানসিক কোনো ত্রুটি-বিকৃতি নেই—এ হতেই পারে না। মুসলিম লীগ-হিন্দু মহাসভার স্রষ্টা কি ইংরেজরা? উশকানি তো তারা দেবেই, তাকে মেনে নিল তো ভারতবাসীই। মানুষ অচ্ছুত—এ দর্শন কি তাদের? ইংরেজ আদালতে রায় দেয়, কিন্তু দেশপ্রেমিককে হত্যা করবার জন্য ফাঁসির দড়িতে টান দিয়েছে কে? ইংরেজ আদেশ দিয়েছে, কিন্তু নিরীহ মানুষের ওপরে জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়েছে ভারতীয় সৈনিক। মন্দিরে গোমাংস ছুঁড়ে দেওয়া, মসজিদের পাশ দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় মিছিল নিয়ে যাওয়া,—পরিণামে রক্তক্ষয়, এসব কারা করেছে? অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে এত লজ্জা কেন?

দ্বিজাতিতত্ত্বের মন্ত্র ইংরেজদের তৈরি। আর আমরা সেটা মেনে নিলাম? ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনে বিশ্বাসী পণ্ডিতেরাও মেনে নিলেন? কাটরা মসজিদ প্রত্নিদর্শন হিসেবে বহুকাল আগে থেকেই স্বীকৃত, ইংরেজরা বলেছিল সেখানে নমাজ পড়তে? যাঁরা অপরাধ করলেন তাঁরা রয়েছেন বহাল তবিয়তে, মারা পড়লেন সাধারণ কিছু গরিব মানুষ। রামজনমভূমি তো বহুকাল থেকেই বন্ধ, শিলাপূজা করতে কি প্ররোচনা দিয়েছিল ইংরেজ? আর বিভেদপন্থাকে যদি জাগিয়ে দিয়ে থাকে ইংরেজ, তার প্রভাব ৪৩ বছরেও প্রতিহত করা যাবে না? আসল রোগের লক্ষণ রয়েছে শিক্ষায় চিন্তায় মননে এবং সংকীর্ণতায়। আমাদের স্বভাব অ্যামিবার মতো, বিভক্ত হওয়াতেই আনন্দ। একটি রাজনৈতিক দল কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠী ভেঙে যে শত অংশ হচ্ছি, তা ওই অ্যামিবা-স্বভাবের জন্যই।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কিছুদূর এগোবার পরেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ রাজনীতিকে গ্রাস করল। এমনিতেই আমাদের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কিত চেতনা প্রায় অনুপস্থিত। দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের চেয়ে গোষ্ঠীভাবনা অনেক বেশি প্রবল, দেশের উর্ধ্বে দলকে প্রাধান্য দিতেই আমরা ব্যস্ত। দল ও ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য মানুষের প্রয়োজন যেটুকু, তার বাইরে মানুষের সাহচর্য আমরা এড়িয়ে চলি। অসাধুতা ও ব্যক্তিস্বার্থ আমাদের উচ্চতর জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। এসবের সামূহিক ফল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

একটি স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ না করে উপায় নেই। ইংরেজরা বিভেদপন্থা জাগাতেই তফসিলি সম্প্রদায়ের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেইসঙ্গে আদিবাসীদেরও। আদিবাসী বিষয়টি নৃবিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু তফসিলি সম্প্রদায়ের কোনো ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তি নেই। স্বাধীন ভারতেও এই প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখা হল শুধুমাত্র এইসব সম্প্রদায়ের সমর্থন পাওয়ার আশায়। অর্থ নৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া মানুষের কল্যাণ এভাবে যে করা যায় না, আজ সকলেই তা উপলব্ধি করছেন। আর এই বিশেষ সুযোগ পাবার জন্য আজ অনেকেই "হরিজন" হতে চাইছেন। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস, জাতি-বৈরিতা দূর করে যখন সমতার লড়াই চালানো হচ্ছে, তখন একদল মানুষ 'অচ্ছুত' হতে চাইছেন। একসময় ঝাড়খণ্ড ও উত্তরবঙ্গের দুটি আদিবাসী গোষ্ঠী লড়াই করে তালিকা থেকে তাঁদের নাম কাটিয়েছিলেন, আজকে তাঁরাই তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলন করছেন। মুসলমান জনগণের কিছু অংশও সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ চাইছেন, নিজেদের জন্য আলাদা আইন চাইছেন (কিছু-কিছু আইন অবশ্য আছে)। আর কত বিভাজন ঘটানো হবে?

গোখেল ও গান্ধীজী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসারের কাল থেকেই রাজনীতিতে ধর্মের আমদানি করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক, কিন্তু তার মধ্যেই কি হিন্দুত্বের বীজ নিহিত ছিল না? ভারতীয় রাজনীতির জন্মলগ্নেই ধর্মের সঙ্গে একাত্মতা ছিল বলেই আত্মবিরোধ প্রথম থেকেই বিষবৃক্ষ রোপণ করতে পেরেছিল। নইলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কী করে বেনারসে "হিন্দু" বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড়ে "মুসলিম" বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন? সরষের মধ্যেই ভূত বেশ শক্তিশালী ছিল।

জিন্নার পাকিস্তান দাবির সময় থেকেই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। আবার স্বাধীনতার পরে তফসিলিদের সুযোগ দেবার ফলে অন্য বর্ণের লোকদের মানসিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। আজকে যে-কোনো সরকারি কর্মস্থলে গেলেই এই বিরূপতার কদর্য প্রকাশ্য ছবি সবাই দেখতে পাবেন। শিক্ষার প্রসার ঘটছে, এমনকী বিজ্ঞান-শিক্ষারও, বিজ্ঞানচিন্তা-প্রসারে অনেক সংগঠন বেশ তৎপর,—আর আমরা সরকারি এবং জাতীয় বিভেদ-নীতির ফলে শতধা বিভক্ত হচ্ছি। একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বেড়ে চলেছে। অন্য ধর্মের প্রতি সহযোগ আমরা আশা করব কোন্ যুক্তিতে?

সুদূর অতীত কিংবা নিকট অতীতের কথা ছেড়ে সাম্প্রতিক কালে লৌকিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বহু বছর আগে হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে আতঙ্কিত হয়ে তীব্র ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না।' অনেক বছরের ব্যবধানে হিন্দু এবং মুসলমানদের কিছু অংশের সক্রিয় প্রচেষ্টায় সেই বিভীষিকা আজ বহুগুণ বৃদ্ধির পথে। এই বিভীষিকার পথ থেকে সম্প্রীতি ও সুস্থতার পথে ফেরাবার লোকের সংখ্যা তাই দিনে-দিনে কমে আসছে, যাঁরা আছেন তাঁরাও ক্রমে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন,—কারণ ভোটসর্বস্ব মনুষ্যত্বহীন ক্ষমতা-দখলের রাজনীতি সংকীর্ণতার তোয়াজ করে চলেছে, কাউকে কিছু বলবে না, লাভের জন্য যে-কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের বলিদান তাদের কাছে অনভিপ্রেত নয়। সর্বগ্রাসী অসুস্থ রাজনীতি আজ গ্রাম-গঞ্জের মানুষকেও প্রভাবিত করেছে। এটাই বড়ো ভয়ের, বড়ো আশঙ্কার কথা। কেননা, গ্রামীণ লৌকিক জীবনে সম্প্রীতির সুন্দর ক্ষেত্রে চিড় ধরলে গোটা দেশ ভেঙে পড়বে,—ছেচল্লিশ, পঞ্চাশ কিংবা চৌষট্টির অন্ধকারময় দিনগুলোতেও এই বীভৎসতা ঘটে নি, তা নাগরিক কলুষতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

মিরাট, জামশেদপুর আর ভাগলপুরে সরকারি পুলিশবাহিনী আশ্রয়প্রার্থীদের ওপরে নির্বিচারে আক্রমণ করে তাঁদের হত্যা করেছে, যারা রক্ষাকর্তা তারাই জীবনহানির কারণ হয়েছে—এতে আজ চতুর্দিকে সবাই বিস্মিত, আতঙ্কিত। এদের বিস্ময় দেখে আমি নিজেও বিস্মিত। এটা কি স্বাধীন ভারতে নতুন কোনো ঘটনা? কোনো জঙ্গি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশ গুলি চালাতে "বাধ্য" হয়, সরকারি তরফে তাকে সমর্থনও জানানো হয়। কিন্তু হরিজন-গিরিজন খেতমজুর যখন মাঠে কাজ করেন কিংবা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে একটু স্বাধীনতা উপভোগ করার ক্ষীণ চেষ্টা করেন, বিনা প্ররোচনায় উচ্চ জাতির দম্ভে যখন তাঁদের রক্ত মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তখনও তো সরকারি তরফে দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না! যে শান্তিরক্ষক বাহিনী নিজের ধর্মের আওতার মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না, তারা বিধর্মীর প্রতি কী আচরণ করবে তা বোধহয় অনুমান করা শক্ত নয়। স্বাধীন ভারতে সাধারণত কোনো রাজ্য সরকার বিচার-বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন না, চাপে পড়ে যেগুলো দেন তার তদন্তের রিপোর্ট কি কোনোদিন জনগণ দেখেছেন? প্রধানমন্ত্রীকে কাপুরুষের মতো হত্যা করাকে কেউ কোনোকালে সমর্থন করেন না, যাঁরা এই ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাদের চরম শাস্তি

হোক, সবাই তাই কামনা করেন। কিন্তু নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশু, যাদের সঙ্গে হত্যাকারীদের দর্শনের সম্পর্ক নেই, তারা নিহত হল কেন? এই বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো বিস্তৃত রিপোর্ট তো আজও জনগণ জানতে পারলেন না। একজন দুষ্কৃত-কারী অভিসন্ধি করে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের স্মারকচিহ্ন অপহরণ করল। সেখানে এই যে স্মারকচিহ্ন রয়েছে—সে খবর অধিকাংশ মানুষই জানতেন না, অথচ তিন-চার শ মানুষ ভারতে-পূর্ব পাকিস্তানে নিহত হলেন। স্মারকচিহ্ন পাওয়া গেল,—কিন্তু যার বা যাদের অপকর্মে নিরীহ ভাই-বোন মারা পড়ল, তাদের কি কোনো শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে? প্রেম হয়েছে হরিজন কৃষকের মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরের ছেলের। তারা পালিয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। ঠাকুরদের বন্দুকের গুলিতে বিশ-পঁচিশজন হরিজন প্রাণ দিলেন, এঁরা প্রেমিক-প্রেমিকাকে চিনতেনও না। এভাবেই চলছে, প্রতিকার-হীন লজ্জাহীন এক ধারাবাহিক সমাজব্যবস্থা।

কোনো সুস্থ সমাজ জোর করে কারও ধর্মের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। যুক্তিবাদী শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একজন ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নাস্তিক্য দর্শনে বিশ্বাসী হতে পারেন। যত বেশি-বেশি মানুষের মধ্যে ধর্মবিমুখতার এই উপলব্ধি আসবে, সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ক্ষেত্র ততই অনুর্বর নিষ্ফলা হয়ে উঠবে। এটাই মানুষের সুস্থতম উপলব্ধি হওয়া উচিত। তা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ধর্মের অধিকারকে সম্মান জানাতেই হবে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে পালন করবার সুযোগ দিতেই হবে। শক্তিপ্রয়োগ করে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো যায় না। সাময়িকভাবে সাফল্য এলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ধর্মীয় ক্ষুধা প্রায় দৈহিক ক্ষুধার মতোই প্রবল ও আমৃত্যু-সঙ্গী।

আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিলে যথার্থ ধর্মমত বোধহয় সব একই। যিনি আচারসর্বস্বতাকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের যথার্থ ধর্ম আচরণ করেন তিনি গোঁড়া ভক্ত হতে পারেন না, অন্য ধর্মকে সমানভাবে সম্মান জানাতেও জানেন। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ করিম চাগলা, বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রভৃতি হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু গোল বাঁধে বহিরঙ্গ আচার নিয়ে, ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ যখন মন্দির-মসজিদ-গির্জা-গুরুদ্বার ছেড়ে পথে নামে। একজনের বৈভবপূর্ণ মিছিল যখন অন্যকেও বৈভবপূর্ণ করতে প্ররোচনা দেয়। আর সরকারি তরফে এইসব বেলেল্লাপনাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই মেনে প্রশ্রয় দেওয়া হয় যখন, তখনই মানসিক সাম্প্রদায়িকতা দৈহিক সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয়। এ কোন্ অন্ধকারময় বুনো সামাজিক ধর্মাচরণ? রামনবমীর মিছিল বেরুবে রাঁচির পথে, অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তাই শান্তিবাহিনীর বেষ্টনী দাও। মহরমের মিছিল যাবে কলকাতার কলুটোলা দিয়ে, সাজো-সাজো রব। গুরু গোবিন্দের স্মৃতিতে পদযাত্রা হবে রাসবিহারী জগৎসুন্দরী গুরুদ্বার থেকে, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করো। এসব চলছে, আর স্বাভাবিক বলে এসব আমরা মেনেও নিচ্ছি। ধর্মের কোথায় এসব আচরণীয় কর্তব্য লেখা রয়েছে? ধর্মস্থানের চত্বরে এগুলো সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিলে কি ধর্মবিরোধিতা করা হয়? এগুলো পালনের অবাধ সুযোগ দিলেই কি ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকে? ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সহনশীলতা। উগ্রতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থই তাহলে ভারতীয় সহনশীলতা? এইসব সম্পর্কে সঠিকভাবে কঠোর হতে না পারলে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে হিংসা-দ্বেষ-সংকীর্ণতা বাড়বেই।

কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সৎ সদস্য পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ করেন না, শ্রাদ্ধের পালনীয় পোশাক পরা কিংবা মাথামুণ্ডন করেন না। যিনি মানসিক এই উৎকর্ষে পৌঁছেছেন, তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়। আর এ তাঁর ব্যক্তিগত দর্শন ও অভিরুচি। কিন্তু পাড়ায়-বন্ধুমহলে-কর্মক্ষেত্রে তাঁকে বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় এবং তা আজকের দিনেও। মহম্মদ করিম চাগলা কিংবা সফদার হাসমিকে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সমাধিস্থ না করে দাহ করা হয়। একান্ত ব্যক্তিগত দর্শন ও অভিরুচি। তাঁদের নিজস্ব "ধর্ম" পালনের অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। অথচ কত উষ্মাই না সেদিন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তোমার আচরণীয় ধর্মপালনে যেমন কেউ বিরূপতার সৃষ্টি করছে না, তোমার কোনো অধিকার নেই অন্যকে বিরূপ মন্তব্যে বিদ্ধ করা। এইসব ছোটো-ছোটো ঘটনা তুচ্ছ নয়, এগুলোর মিলিত রূপেই অশান্তির সৃষ্টি। বিরুদ্ধ সমালোচনার বিরোধিতা না করলে এইসব অমানবিক ধর্মীয় বৈরিতা বেড়েই চলে।

সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন যুক্তিবাদী শিক্ষা, ভারতে অবস্থানকারী সমস্ত ধর্মের শাস্ত্র-পুরাণ-কিংবদন্তীর সমাজবিজ্ঞাননির্ভর ব্যাখ্যা ও শিল্পবিপ্লব। এর কোনোটিই গ্রামীণ ভারতকে আজও স্পর্শ করে নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষার চল এখনও আছে। এইসব ক্ষেত্রে তরুণ-কিশোর ছাত্রদের মধ্যে শিশুকাল থেকেই আচারগত ধর্মের প্রতি আজ্ঞাবাহী করে তোলা হয়। মুক্ত বিচার নয়, অন্ধবিশ্বাসই সেখানে প্রচার করা হয়। মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বার-গির্জা -ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় সমীক্ষা করলে যে-কেউ যুক্তিহীন আজ্ঞাপালনের এই শিক্ষার বিষময় হদিস পাবেন। আজ ধর্মীয় শাস্ত্র-সমূহের নির্মম বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণ প্রচার করতে হবে। তবে এই কাজ করতে হবে সেই বিশেষ ধর্মের যুক্তিবাদী মানুষকে। বাবাসাহেব আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের ধাঁধা বিশ্লেষণ করেছিলেন। আজ মহারাষ্ট্রে তাই নিয়ে কী রক্তাক্ত কাণ্ডই না ঘটছে। অবশ্য স্বধর্মের কেউ সমালোচনা করলেই যে বিরোধ ঘটবে না তা নয়, তবে তাকে সামাল দিতে অন্তত অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা সম্ভব হবে না। উপায় নেই, এই কৌশল গ্রহণ না করে উপায় নেই।

সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটুক, অযোধ্যার বিরোধ স্তব্ধ হোক, ভারতবাসী হিসেবে সকলে নিজের-নিজের ধর্ম পালন করে সুস্থ সমাজ ও পরিবেশ গড়ে তুলুক, এই সদিচ্ছা ও কামনা থেকে কত কথাই না আজ যুক্তিবাদী মানুষকে বলতে হচ্ছে। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সঙ্গে যেন আর পরিচয় না ঘটে, নিরীহ সমাজ-বদ্ধ সংহত মানুষকে যেন আত্মীয়বিয়োগের বীভৎস দৃশ্যগুলো আর দেখতে না হয়,—এসব কথা আজও প্রচার করতে হচ্ছে। এর চেয়ে লজ্জার এবং দুঃখের কথা আর কী হতে পারে! শিক্ষার প্রসার ঘটছে, বিজ্ঞানের পাঠ সহজতর হচ্ছে, ডারউইনের তত্ত্ব স্বীকৃত, নৃবিজ্ঞান মানুষের উদ্ভব-ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোকিত করেছে মানুষকে, তবু আজ ধর্মীয় উন্মাদনা কেন শুধু বেড়েই চলেছে! বিকল্প আদর্শের অভাবে সারা পৃথিবীব্যাপী ঘটে চলেছে এই উন্মাদনা।

আজ আয়ারল্যান্ডে খ্রীষ্টান-খ্রীষ্টানে, পাকিস্তানে মুসলমানে-মুসলমানে, ভারতে হিন্দুতে-হিন্দুতে ঘটে চলছে রক্তাক্ত বিরোধিতা। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে হানাহানি তো অতি তুচ্ছ বিষয়। গোটা পৃথিবী জুড়ে মানবিক যুক্তিবাদী মানুষেরা আজ একঘরে, তাঁদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ আজ আর্তনাদ হয়ে সাম্প্রদায়িকতার দেয়ালে-দেয়ালে মাথা কুটে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। তবু ব্যর্থতাই শেষ কথা নয়। বিবেকহীন বিবেকের বিরুদ্ধে, মনুষ্যত্বহীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আজ যুক্তিবাদী সংখ্যালঘু 'ধর্মবিরোধী' মানুষকে সংগ্রাম তো করে যেতেই হবে।

কীর্তনের সামাজিক ইতিহাস

বিজিতকুমার দত্ত

কীর্তনের ইতিহাসকথার শুরুতে কীর্তনের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন লেখক। ভগবানের যশোকীর্তন করাই কীর্তনের উদ্দেশ্য। এই কীর্তনকে বৈষ্ণবেরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। হিতেশরঞ্জন তথ্য ঘেঁটে দেখিয়েছেন চৈতন্যের আবির্ভাবের আগেই কাটোয়া, শান্তিপুর, কুলীনগ্রাম, নবদ্বীপ অঞ্চলে কীর্তনের ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল। অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, ঘোষ ভাইয়েরা, মালাধর বসু, হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তেরা কীর্তনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন খুব বেশি। এই কীর্তন একক অথবা সম্মেলক। তবে সম্মেলক কীর্তনকেই বেছে নিয়েছিলেন বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ। কেননা সম্মেলক কীর্তনে সকলের অধিকার আছে। হিন্দু-সমাজের বৃহত্তর অংশ (হিতেশরঞ্জন বলেছেন নবশাখ, জল-অচল ও অন্যজ হিন্দু প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ) এই কীর্তনে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিল। সুতরাং বৈষ্ণবধর্মের যে আহ্বান তা কিছু শাস্ত্র-অভিমানী অথবা অন্য ধর্মসম্প্রদায়কে আলোড়িত করতে না পারলেও অধিকাংশ হিন্দুসমাজকেই উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিল। এই কীর্তনের মধ্য দিয়েই বৈষ্ণবসমাজ মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। হিতেশরঞ্জন তথ্য থেকে একথাও প্রমাণ করেছেন, তান্ত্রিক সাধনায়ও কীর্তন ছিল না এমন নয়। কিন্তু তা ছিল যৌগযৌগিক সাধনা। গুহ্যসাধনার এই রূপ সাধারণত লোকচক্ষুর অগোচরেই ঘটত। আর বৈষ্ণবের কীর্তন ছিল প্রকাশ্য। সুতরাং সকলের গ্রহণযোগ্য হয় এমন ধর্মই ছিল কীর্তনের। কীর্তন বহুজনহিতায়। বৈষ্ণবসাধনা সহজ, অনাড়ম্বর। কীর্তনের মতো এমন অনাড়ম্বর বিষয় আর কী হতে পারে! চৈতন্য কীর্তনের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি ভক্তদের একথা বোঝাতেন যে কীর্তন করেই তিনি দেশকে জাগাবেন। কীর্তন-বিরোধীরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁদের প্রশ্ন ছিল— ঘরে বসেই তো সাধনা করা যায়। পথে-পথে ঢাকঢোল বাজিয়ে ভগবান্‌স্মরণ—এ কেমন ধারা? তাঁরা সেজন্য চৈতন্যের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাছাড়া চণ্ডাল যদি কীর্তন করে তো শাস্ত্রই অপবিত্র হয়ে গেল। চৈতন্য এই পারিপার্শ্বিককে জানতেন। তিনি একে উপেক্ষা করেছিলেন নিজের এবং ভক্তদের জোরে। নবদ্বীপে এবং অন্যত্র কীর্তনকে তিনি প্রসারিত করে দিলেন। বৈষ্ণবসাধনার অনেক পরিবর্তন হলেও সম্মেলক কীর্তন আজও বহুমানিত। চৈতন্য গোড়ায় তিনজনের বাড়িতেই কীর্তনকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এই তিন বাড়ি হল, তাঁর নিজের গৃহ, চন্দ্রশেখরের বাড়ি ও শ্রীবাসের অঙ্গন। নবদ্বীপে ভক্তরা এসে জুটতে লাগল। সুদূর চট্টগ্রাম থেকে ভক্ত নবদ্বীপে এলেন। নিত্যানন্দ হরিদাস এখানে আশ্রয় পেলেন। অদ্বৈত তো আছেনই। আমরা দেখতে পাচ্ছি চৈতন্য ধীরে-ধীরে নায়কের মর্যাদায় ভূষিত হচ্ছেন। তিনি সঙ্কীর্তনের (সম্মেলক কীর্তন) মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে একতা গড়ে তুললেন। হিতেশরঞ্জন মনে করেন তান্ত্রিকদের মতোই বাড়িতে এই সঙ্কীর্তন অনেকটা যৌগযোগীদের সাধনার মতোই। এতে যৌগযোগীদের সম্বন্ধে যেমন কিছুটা সংশয় মানুষের ছিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধেও সেরকম ধারণা লোকমানসে দেখা দিল। হঠাৎ একদিন চৈতন্য বেরিয়ে এলেন পথে। সঙ্কীর্তনের সময় নৃত্য একটা বড়ো ব্যাপার ছিল। বেড়া-নাচ ছিল প্রধান। যাই হোক চৈতন্যের নবদ্বীপের সাধারণ মানুষের প্রতি বাল্যবয়স থেকে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সঙ্কীর্তনের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সাধারণ মানুষও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল।

এ ব্যাপার কিছু মানুষের ভালো লাগল না। তাঁরা সুলতানের কানভারি করল। সুলতানও এসব বন্ধ করতে চেয়েছিল। রাজকর্মচারী রূপসনাতন এবং কেশব ছত্রী চৈতন্যকে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে দেন নি। চৈতন্যের জন্য নবদ্বীপবাসীর কিছু মানুষ বিপদে পড়তে পারেন এই ভেবে তারা জল্পনাকল্পনায় মেতে উঠেছিল। নবদ্বীপের কাজী একদিন সত্যই কীর্তন শুনে কিছু অত্যাচার করলেন। চৈতন্য এ সহ্য করতে পারেন নি। তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, এবং আইন অমান্য করলেন। হিতেশরঞ্জন লিখেছেন, কৃষ্ণদাসের মতে কাজী সঙ্কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। হিতেশরঞ্জন তা মনে করেন না। যদি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতেন তবে তা বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করতেন। কিন্তু সেখানে এ সংবাদ নেই। হিতেশরঞ্জনের সিদ্ধান্ত এ সঙ্কীর্তনের সাহায্যে কাজীর বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ সঙ্ঘশক্তির পরিচায়ক। লোকের মন থেকে ভয় ভাঙিয়ে দিতেও সঙ্কীর্তন সাহায্য করেছিল। চৈতন্য নবদ্বীপবাসীর চিত্তে জোর এনে দিলেন এই সূত্রে। নগরকীর্তনে মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধন হল।

হিতেশরঞ্জন এই ঘটনাটির আরও একটি তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। চৈতন্যের মৃত্যুর কিছুকাল পরে আর-একজন বৈষ্ণবসাধক এবং বড়ো কীর্তনীয়া শ্যামানন্দ কীর্তন করতে-করতে যখন পথপরিক্রমা করছিলেন তখন শের খাঁ নামে এক পাঠান তা বন্ধ করতে বলে। শ্যামানন্দ থামেন নি। শের খাঁ বাদক-গণের ঢাক ঢোল ভেঙে দেয়। এই কাহিনীটির পরের অংশ অলৌকিক। হিতেশরঞ্জন কেবল বলেছেন, সঙ্কীর্তনে যে রাজশক্তির বিরোধিতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু হিতেশরঞ্জন আরো বলেছেন, বৈষ্ণবদের কাজীবিজয় ব্যাপারের পর নামপ্রচারের পথ বাধামুক্ত হয়েছিল অনেকটাই। সুলতানের রাজ্যশাসনের জন্য গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ ছিল। এই পথে শাসনের বড়ো-বড়ো কেন্দ্র ছিল। বৈষ্ণবধর্মও সঙ্কীর্তনকে হাতে নিয়ে গঙ্গার উপকূল ধরে এইসব কেন্দ্রে ঘাঁটি স্থাপন করতে আরম্ভ করল। ছত্রভোগ, হাতিয়াগড়, অম্বুয়া, বর্ধমান, সালিমাবাদ, কুমারহট্ট, কাঁচরাপাড়া—এইসব অঞ্চলে বৈষ্ণবতার জোয়ার এল।

এবার শুরু হল চৈতন্যের ভারতপরিক্রমা। শান্তি-পুর থেকে নীলাচল যাওয়ার পথে সঙ্কীর্তন ছড়িয়ে পড়ল 'সর্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে'। চৈতন্যের যাত্রাপথে সব জায়গাতেই জনসমাগম হয়েছিল। সঙ্কীর্তন অবশ্যই প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য। চৈতন্য নিজে ঘুরে-ঘুরে বাঙলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই সঙ্কীর্তনের প্রচার করলেন। আর বৃন্দাবনের গোস্বামী-দের মত জানবার জন্য লোক পাঠালেন। চৈতন্যের এই কাজে ভক্তবৃন্দ এগিয়ে এলেন সানন্দে। তিনি যেতে পারেন নি এমন অনেক জায়গায় ভক্তবৃন্দ বৈষ্ণবমন্দির তৈরি করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সঙ্কীর্তনের ঢেউ বইয়ে দিলেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি —বাঙলা, বৃন্দাবন এবং নীলাচল এই তিনটি অঞ্চলেই বৈষ্ণবতার জোয়ার এনে দিলেন চৈতন্য। হিতেশরঞ্জন চৈতন্যের ভ্রমণের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম সংগ্রহ করেছেন। চরিতকারদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা-মূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণার এই পদ্ধতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগায়। সঙ্কীর্তন প্রসঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এই সূক্ষ্ম গবেষণা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু হিতেশরঞ্জন বই লিখেছেন সমাজ-বিজ্ঞানী হিসেবে। সমাজের উপর কীর্তনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেয়েছেন তিনি। আর এই বোঝাটা তাঁর কাছে সার্থক হয়ে ওঠে যখন তিনি প্রতিটি তথ্য যাচাই করে সঙ্কীর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আবিষ্কার করতে পারেন। কেবল ভক্তির

বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস—হিতেশরঞ্জন সান্যাল। সেনটার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলিকাতা। কে. পি. বাগচী অ্যানড কোম্পানী। পঁচাত্তর টাকা।

দিক থেকে নয়। সমাজের আচণ্ডাল চৈতন্যের অভিপ্রায়কে কিভাবে সার্থক করে তুলেছিল এও হিতেশরঞ্জনের অন্বিষ্ট। এই প্রসঙ্গটি দীর্ঘ এই কারণেই।

পরবর্তী পর্যায়ে লেখক নীলাচলে সঙ্কীর্তনের ব্যাপারগুলি বিস্তৃত করেছেন। নীলাচলেও চৈতন্যের ভক্ত জুটে গেল। কেউ বাঙলাদেশ, কেউ কাশী থেকে নীলাচলে এলেন। রায় রামানন্দ, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম স্বরূপ দামোদর তো ছিলেনই, আরো অনেকেই এসে মিলিত হলেন। চৈতন্য পুরীর মন্দির পরিক্রমা করলেন কীর্তনীয়াকে নিয়ে। গুণ্ডিচাবাড়িতে নৃত্য করলেন। পুরীর সবচাইতে বড়ো উৎসব রথযাত্রা। চৈতন্য সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনীয়া দল নিয়ে নাচতে-নাচতে কীর্তন করলেন। এসব সঙ্কীর্তন খুবই সাড়া জাগিয়েছিল সে সময়ে। পুরীর রাজাও মেতে উঠেছিলেন। নীলাচলের কীর্তনে পূর্বপরিকল্পনা লক্ষ করবার মতো। সবই ছিমছাম, সুনিরূপিত এবং সুপরিকল্পিত। বাদ্যের ঘনঘটা কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হিতেশরঞ্জনের অভিমত হল নবদ্বীপের কীর্তন অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণতা ঘটল নীলাচলে কীর্তনের পরিবেশনে। এ সম্বন্ধে সঙ্গীতবিদগণ বলতে পারবেন—এ অভিমতের মূল্য কতখানি।

লক্ষণীয়, কীর্তনের পরে পদগান করার অভ্যাস ভক্তদের মধ্যে ছিল। নবদ্বীপেও এই প্রথা চালু ছিল। মুকুন্দ পদ গেয়েছিলেন। বিদ্যাপতির পদ এবং আরো কারো-কারো পদ গাওয়ার কথা জীবনচরিতে পাই। নীলাচলে তো চৈতন্য জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদ গাওয়ার রীতি খুবই রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতেন। হিতেশরঞ্জন বলেছেন এই পদগীতি বৈঠকি। অল্প শ্রোতার কাছেই তা উত্থাপিত হত। নীলাচলে কীর্তনের সঙ্গেও পদগান করা হত। এখন নীলাচলে চৈতন্য কয়েকজনকে নিয়ে যে পদাবলী কীর্তন শুনতেন এবং প্রকাশ্যে সঙ্কীর্তনে যে পদগান করা হত তার গায়নরীতি নিশ্চয়ই একরকমের ছিল না। জয়দেবের গান রাজসভায় গাওয়া হত। অতএব তা বৈঠকি পর্যায়ের। সেই আদর্শই পদগানের আদর্শ ছিল বলে হিতেশরঞ্জন বলেছেন। কিন্তু প্রকাশ্য সঙ্কীর্তনের যে পদ গাওয়া হত তাও কি বৈঠকি গানের মতো ছিল? লেখকের অনুমান, বোধহয় নয়। একটা প্রশ্ন এখানে তোলা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাটগীতজাতীয় কাব্য। এই নাটগীতের বিকাশ খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙলা মৈথিলীতে আমরা নাটগীত পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও সঙ্গীতমাধবের মতো রচনা বাঙলায় পাই। নেপালে প্রাপ্ত নাটগীত ললিত-কুবলয়াশ্ব, হরগৌরী, বিদ্যাসুন্দর এবং বিদ্যাপতির গোরখবিজয় নাটকের কথা মনে পড়বে। এসব নাটগীতিতে পদ প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। মৈথিলীতে কীর্তনীয়া নাটক তো এই পদেরই গান। আসামে অঙ্কিয়া নাটকের কথাও মনে পড়বে। এসব নাটকের পদের গায়নপদ্ধতি কী ছিল? বৈঠকি কি? রাগরাগিণীর উল্লেখে তা মনে হতেও পারে। কিন্তু যা অভিনীত হত তাতে বৈঠকি মেজাজের সঙ্গে কিছুটা লোকসঙ্গীতের মিশ্রণ থাকাও সম্ভব। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে একদা ঝুমুর গানের মতো বলেও অভিহিত করেছিলেন। যাই হোক, হিতেশরঞ্জন এই সঙ্কীর্তনে প্রকাশ্যে যে পদগান করা হত তাই পরবর্তী কালে খোলা আসরের লীলাকীর্তন বলে অভিহিত করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে চৈতন্যভক্তবৃন্দ, বিশেষ করে অদ্বৈত আচার্য এবং পরে অনেকে চৈতন্যকীর্তনের শুরু করলেন তার কথা পাই। চৈতন্যের নিষেধ সত্ত্বেও চৈতন্যকেই 'বনমালী', 'বৈকুণ্ঠবিহারী', 'সংকীর্তনরসিক মুরারি' ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করে সঙ্কীর্তন শুরু হয়ে গেল। নিত্যানন্দ বাঙলাদেশে এসে সঙ্কীর্তনে চৈতন্যমহিমা খ্যাপন করলেন।

সপ্তম অধ্যায়ে কীর্তনের বিষয় প্রেমভক্তির উৎস-সন্ধানে লেখক নানা গ্রন্থ-পুঁথি এবং মতবাদের সার-সংকলন করেছেন। বাঙালির ধর্মসাধনায় তন্ত্রসাধনার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তন্ত্রসাধনায় ভক্তির গুরুত্ব নেই। তত্ত্ব এবং তার আনুষ্ঠানিক রূপের বিশদ বিবরণ দিয়ে হিতেশরঞ্জন তন্ত্রের সাধনায় বৌদ্ধপ্রভাব এবং ধীরে-ধীরে সহজিয়া সাধনায় তার রূপান্তর দেখিয়েছেন। এই সহজিয়া সাধনা কিভাবে বৈষ্ণবধর্মে প্রবেশ করল তার পথরেখাকে স্পষ্ট করেছেন লেখক। রামী-চণ্ডীদাস, গৌরনাগরবাদ, চৈতন্যের দেহে যুগলতত্ত্ব এবং পঞ্চমুণ্ডি ভক্তি আর অবধূত নিত্যানন্দের সাধনা—এসবের মধ্যে তান্ত্রিকতার প্রশ্রয় এবং গ্রহণ দেখতে পেয়েছেন লেখক। এ বিষয়ে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে : *Obscure Religious Cults*। আরো অনেকেই বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন হিতেশরঞ্জন বলেছেন, 'একেবারে প্রথম হইতে সহজপন্থীরা ভক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্যে থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তাহাদের প্রভাব অবিশ্লেষ্যভাবে জড়াইয়া আছে' (পৃ ১৩৮)।

প্রেমভক্তি প্রসারে নিত্যানন্দ নর্তক, চৈতন্য সূত্রধার। নিত্যানন্দের প্রচারের সময় কীর্তনের জমজমাট রূপ দেখা গিয়েছিল সাতগাঁয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে নানা শ্রেণীর বণিক ছিলেন এখানে। সাতগাঁয়ের বণিকরা চৈতন্য-অনুরাগী ছিলেন। নিত্যানন্দের প্রচারের সীমানা ছিল বিস্তৃত। মুর্শিদাবাদের চৌয়ারিগাছা থেকে সুন্দরবনের ছত্রভোগ ও হাতিয়াগড় পর্যন্ত। পুবদিকে বুড়ন (যশোহর, বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমে তমলুক ও খানাকুল পর্যন্ত তিনি পরিক্রমা করেছিলেন। প্রায় সাতাশ বছর নিত্যানন্দ অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে প্রেমভক্তির ধর্মকে প্রচার করেছেন। নিত্যানন্দ ছিলেন মুক্তমনের মানুষ। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু দিক ছিল যা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের ভালো লাগে নি। আবার খোলা মনের মানুষ ছিলেন বলে সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালোবেসেছিল। যাই হোক, চৈতন্য যে প্রেমভক্তি অনুভব করবার জন্য এবং ঈশ্বর-আরাধনার উপায়স্বরূপ সঙ্কীর্তনের আরম্ভ করেছিলেন, নিত্যানন্দই তাকে গৃহে-গৃহে পৌঁছে দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ছাড়া অন্য বৈষ্ণব আচার্য-মহান্তরা এই কাজ করেছেন বটে কিন্তু নিত্যানন্দের কৃতিত্বই সমধিক। নিত্যানন্দ বিধিবিধানের ধার ধারতেন না। তিনি সাহস করে চৈতন্যকে বলেছিলেন, 'কাঠিন্য কীর্তন কলিযুগধর্ম নহে।' তিনি দীনের চেয়ে দীনের ঘরে আসন পাততে চেয়েছিলেন বলেই শাস্ত্রাচার-লোকাচারকে আমল দেন নি। চৈতন্য এটা বুঝতে পেরেছিলেন। জয়ানন্দ নিত্যানন্দ সম্বন্ধে ঠিকই বলেছিলেন, 'ঘরে-ঘরে সঙ্কীর্তন পাতিলেক খেলা।' বলা বাহুল্য, চৈতন্যের মৃত্যুর পর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি সরকার, গদাধর পণ্ডিত, গদাধর দাসকে কেন্দ্র করে আলাদা-আলাদা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নানা বিরোধ ছিল। সাধনবিষয়ে গুরুতর মতপার্থক্য এবং ব্যক্তিগত রেষারেষি এর অন্যতম কারণ। হিতেশরঞ্জন বলেন, 'চৈতন্যদেবের তিরোধান হইবার পর বাঙ্গলা ও বৃন্দাবনের সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বাঙ্গলার গোষ্ঠীনায়কগণের মনে বৃন্দাবনের শাস্ত্রচর্চা সম্পর্কে কোনও আগ্রহ ছিল না। অপরদিকে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীরা বাঙ্গলায় চৈতন্যপরিকরদের ভক্তিধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কখনও উৎসাহ দেখান নাই' (পৃ ১৬৯)। বৃন্দাবনের সঙ্গে নবদ্বীপের এই ছাড়াছাড়ি একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা বলা যেতে পারে। চৈতন্য নবদ্বীপের সঙ্গে বৃন্দাবনের সেতুবন্ধস্বরূপ ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে এরকম ব্যাপার ঘটায় আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। হিতেশরঞ্জনও এ বিষয়ে খুব বেশি অগ্রসর হন নি। তিনি জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তমদাস, শ্যামানন্দ আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম করেছেন। বলা বাহুল্য, এঁদের অবদানকে আমরা অস্বীকার করব কী

করে? বৃন্দাবনের সঙ্গে নবদ্বীপের যোগাযোগ তো এঁরাই রক্ষা করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত তো বাংলায় বৈষ্ণবদের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। নরোত্তমের কীর্তন-প্রচার তো গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে প্রবাদপ্রতিম। শ্রীনিবাস আচার্য মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারে প্রধান ব্যক্তি। শ্যামানন্দ মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব আন্দোলনকে প্রসারিত করেছিলেন। এঁরা বৃন্দাবনের শিক্ষাপ্রাপ্ত। মনে রয় বিষয়টির গুরুত্ব বোঝবার জন্য আরও তথ্য প্রয়োজন। সেজন্যেই হিতেশরঞ্জন দশম পরিচ্ছেদে ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশদভাবে বিচার করতে চেয়েছেন। গৌড়-মণ্ডল গৌরপারম্যবাদী আর ব্রজমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য—এই মতবাদী। চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার-মাত্র। গৌড়মণ্ডল এত ভাবেন নি। তাঁরা সরাসরি চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধকগণ একটু ভিন্ন পথ ধরলেন। তাঁরা চৈতন্য ও কৃষ্ণকে অভিন্ন মনে করলেও চৈতন্যে আরাধনার মধ্য দিয়ে সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় বলে মনে করেছিলেন। যাই হোক, নরোত্তম নামকীর্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। জীবের পক্ষে নামকীর্তনই একমাত্র পথ। নরোত্তম নামকীর্তনের নূতন তাৎপর্য দিলেন। আগেকার কীর্তন ছিল আবেগের, অনুভবের, উপলব্ধির। নরোত্তম এগুলিকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু উচ্চতর সাধনমার্গে পৌঁছবার অন্যতম চাবিকাঠি রূপে নামকীর্তনকে মনে করেছিলেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—নরোত্তমের ব্যাখ্যায় মিলেছে এবং মিশেছে গৌরাঙ্গ-উপাসনা, কীর্তনের মাহাত্ম্য এবং সহজপন্থী ধ্যানধারণা।

খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তম কীর্তনগানের পর্যায়, রীতি ইত্যাদি ঠিক করে দিলেন। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, 'অনিবদ্ধ' আলাপের সূচনা, তারপরে গৌরচন্দ্রিকা ('নিবদ্ধ') এবং তারও পরে রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলার কীর্তন। এই ভাবেই নরোত্তম পদগানকে লীলা-কীর্তনে নিয়ে এলেন। গায়ক, বাদক ও দোহারের সমন্বয়ে এই গান। এই গানে মার্গসঙ্গীতের প্রবহমান ধারাটি মিশে গিয়েছিল। নরোত্তমের কীর্তনপদ্ধতির নাম গরানহাটি বা গড়েরহাটি। গরানহাটির সরল রূপ মনোহরসাহী। এসব গানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রূপ। তবে সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ মনে করেন, আখর পদ্ধতিতে লোকসঙ্গীতের রীতি হয়ত কতকটা অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। নরোত্তমপ্রবর্তিত লীলাকীর্তনের রীতিটি আজও চলে আসছে। বাঙলার সংস্কৃতির এটি একটি অন্যতম দান।

হিতেশরঞ্জন ভক্তিধর্মের ইতিহাস, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের কথা সমাপ্ত করে লীলাকীর্তনের বহিরঙ্গ রূপ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। কীর্তনের ইতিহাসে এ আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কীর্তনে বাদ্যের ব্যবহার, আখর, তুক, ছুট ও ঝুমরের গুরুত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। কীর্তন-গানের শ্রেণীবিভাগও সংক্ষেপে করেছেন। শ্রীখণ্ডের কীর্তনীয়ারা নিজস্ব পদ্ধতি বিসর্জন দেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেনেটি ঢঙের কীর্তনের উদ্ভব। রেনেটির চাইতেও সহজ সুরের গান মন্দারণী। এই গানে পাঁচালী ও মঙ্গল গানের মিশেল আছে। মানভূম-সিংভূমের আঞ্চলিক গানের সুর উচ্চাঙ্গ কীর্তনের সুরে মিশিয়ে সৃষ্টি হল ঝাড়খণ্ডী সুর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেয়েকীর্তনীয়ারা বাঈজীদের হাবভাব নকল করে কীর্তনের সুরে নিয়ে এলেন চটুলতা।

কীর্তনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ আখর দেওয়ার আতিশয্য কীর্তনের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল বলে মনে করেন। মূল পদকে আড়াল করে আখর, ছুট, তুক অথবা ঝুমরই বড়ো হয়ে উঠতে চাইত। উনবিংশ শতাব্দে কীর্তনের পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। পদাবলী কীর্তন তবুও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বাঁচতে চেয়েছে এবং এখনো বেঁচে আছে। তবে হিতেশরঞ্জন সান্যাল লীলাকীর্তনকে বলেছেন গ্রামীণ সংস্কৃতির আশ্রয়ে গড়ে ওঠা। খোলা আসরে গাওয়া হত এই গান। সকলে যোগ দিত আগ্রহে, ভক্তিতে। গ্রাম আজ শহরের মুখাপেক্ষী। সুতরাং কীর্তনও সঙ্কটের মুখো-মুখি। আমরা বলব কীর্তনগানের শ্বাস কিন্তু ঠিকই আছে। রবীন্দ্রনাথ একে আদর করেছিলেন। তাঁর কীর্তনাঙ্গ গানে কীর্তনের চরম অভিব্যক্তি। এমনকী বাঙলা গানেও কীর্তনের বিশিষ্ট রূপ ঢুকে পড়ে কখনও কখনও। এইভাবেই তার যাত্রা চলেছে অন্তঃ-শীলাভাবে।

হিতেশরঞ্জনের বই কীর্তনের ইতিহাস। কিন্তু বাঙলার বৈষ্ণবভাবনার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতিরও ইতিহাস। কীর্তনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বৈষ্ণবভাবনা, ও, বৈষ্ণবসাধনা। মুখবন্ধে গৌতম ভদ্র বলেছেন এ বই কীর্তনের সামাজিক ইতিহাস। বাংলা-ভাষায় কীর্তন সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ এবং আলোচনা থাকলেও এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কীর্তন সম্বন্ধে এর আগে কেউ লেখেন নি। সঙ্কীর্তনে এবং লীলাকীর্তনে ব্যাপক জনসংযোগের তাৎপর্য হিতেশরঞ্জন যেভাবে দেখিয়েছেন তা তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মেথডলজিতে প্রকাশ পেয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঠাট বজায় রেখেও বৈঠকি গান কিভাবে গ্রামীণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে-ছিল সেকথা চমৎকারভাবে হিতেশরঞ্জন বলেছেন। ভূমিকায় গৌতম ভদ্র চৈতন্যের উদ্দণ্ড নৃত্যের কথা-সূত্রে বলেছেন: 'এই জাতীয় নৃত্য গীত আর ভাব-বেশের নানা সামাজিক অর্থ সাম্প্রতিক কালের নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় ধরা পড়েছে। সমসাময়িক পীর-বাদে "উরসের" নানা অনুষ্ঠানে, "সমা" বা সঙ্গীতানু-ষ্ঠানের রীতি আমাদের অন্য অনুষঙ্গ আর প্রতিষঙ্গের কথা ভাবতে সাহায্য করে।' হিতেশরঞ্জনের বইতে সে আলোচনা নেই।

হিতেশরঞ্জন আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু বিশ্বাস করি এই বিষয়টিরও তিনি যথার্থ আলোচনা করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতে কীর্তনের রূপে যে নবসাজ ঘটেছিল সেকথা বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি। সেই সূত্র ধরেই বলি রবীন্দ্রনাথের 'আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি' গানটি (১৮৮৪) কীর্তনের সুরে রচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কীর্তনের সুরে ব্রহ্মসঙ্গীতের চল ছিল, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজে ধ্রুপদাঙ্গ সুরেরই প্রাধান্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রসিক। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিজ্ঞপ্তি দেন 'ঐ দিবস মধ্যাহ্ন হইতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য মহাশয়ের ভবনে বহিঃপ্রাঙ্গণে পাঠ, আলোচনা ও সংকীর্তন হইয়া ৩টার সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইবে।' *The Indian Messenger* উৎসবের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানালে—'It is gratifying to see that the Adi Brahma Samaj has at last come to see the importance of Sankirtanas'. "ধর্মতত্ত্ব" পত্রিকায় পাই, 'গত মাঘোৎসবে প্রধান আচার্য মহাশয়ের ভবনে খোল-করতালসহ মহা উৎসাহে তুমুল সঙ্কীর্তন হইয়াছিল। আমরা জানিতাম প্রধান আচার্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্রগণ খোল-করতাল ও সংকীর্তনের মহাবিরোধী ছিলেন। মাঘোৎসবে তাঁহার বাড়ীতে খোল-করতালসহ ব্রহ্মসঙ্কীর্তন হওয়া আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হইবে।' এই তথ্যগুলি প্রশান্তকুমার পালের "রবিজীবনী" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৯৯ পৃষ্ঠা থেকে পেয়েছি। তিনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের কৈফিয়ত উল্লেখ করেছেন। সে কৈফিয়তে দেখি—ব্রাহ্মসমাজ কীর্তনের বিরুদ্ধবাদী নয়। বাজে কীর্তনে তাদের আপত্তি। প্রসিদ্ধ কবি এবং প্রসিদ্ধ গায়কের সমন্বয়ে কীর্তন হলে সমাজ তাকে গ্রহণ করবে। আমরা বুঝে নিতে পারি—রবীন্দ্রনাথ বাঙলা গানে কী পরিবর্তন চাইছিলেন। ঐতিহ্যকে বরণ এবং তার রূপান্তরসাধন রবীন্দ্ররচনায় নূতন পথের দিশা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্কীর্তন এবং নবগৌরাঙ্গ আন্দোলনের কথা স্বতই মনে আসে। হিতেশরঞ্জনের বক্তব্য উনবিংশ শতাব্দীতেও সমর্থিত হয় "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার এই

লেখায়—'ধর্মপ্রচারের এই প্রাচীন প্রথা রক্ষা করা এবং তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর করা আবশ্যক।'

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী

সন্তোষকুমার দে

'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ'—এই ঋষিবাক্য স্মরণ করে বিপুল শ্রীঅরবিন্দ-রচনা এবং বিপুলতর আলোচনা-গ্রন্থসমূহের সম্মুখীন হয়ে বিমূঢ় হতে হয়। 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' নেওয়ার উপদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু হাংসব্রত পালন করা সহজ নয়। আর যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ অপ্রকট হওয়ার (৫ ডিসেম্বর ১৯৫০) প্রায় দীর্ঘ ৪০ বৎসর পরেও তাঁর সম্বন্ধে, এবং তাঁর সাধনার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহীর সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে, তাঁদের সহায়তা করবার জন্য যাঁরা লেখনী ধারণ করেছেন, অপেক্ষাকৃত নবাগত এবং বিদেশী গবেষক পিটার হীজ (Peter Heehs) নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি বলেই গণ্য হবেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *Sri Aurobindo—A Brief Biography* নামক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হতে প্রকাশিত মাত্র ১৭২ পৃষ্ঠার এই পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত রচনাটি পাঠককে এমন দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যে পড়তে শুরু করলে তাঁর তথ্যসংগ্রহের ব্যাপ্তি ও নিষ্ঠায় যেমন বিস্মিত হতে হয়, তেমনি রচনার প্রসাদ-গুণে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

লেখক নিজেকে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত বলতে চান নি, ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁর গুরুর যে মহিমময় মূর্তি প্রতিভাত হয়, তাঁর দৃষ্টিতে সেরূপ কোনো আবিলতা নেই। তাই মানুষ শ্রীঅরবিন্দকে অতি স্পষ্টভাবে চেনাতে ঠিক যতটুকু বলবার তাই তিনি এই গ্রন্থে বলেছেন। তবে তাঁর গবেষণা চলছে শ্রীঅরবিন্দের বিস্তারিত ও খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিতব্য বৃহৎ আকারের জীবনচরিত রচনার জন্য। বর্তমান গ্রন্থে তার ভূমিকা-মাত্র তিনি করেছেন বলা চলে। সেই ভূমিকাটুকুও যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য হয়েছে বলেই গ্রন্থ শেষ করে একটি পরম তৃপ্তি অনুভূত হয়।

ভারতীয় যোগসাধনা বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। পাতঞ্জলের যোগসূত্র এ বিষয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। আকারে ক্ষুদ্র, যেন বটবৃক্ষের বীজের মতো, ঘনসন্নিবদ্ধ সর্বমোট ১৯৫টি সূত্রে গ্রথিত। সমাধিপাদে ৫১টি, সাধনপাদে ৫৫টি, বিভূতিপাদে ৫৬টি এবং কৈবল্যপাদে ৩৩টি সূত্র আছে। কোনোটিই ছন্দোবদ্ধ শ্লোক নয়, অতি সংক্ষেপে গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে ইঙ্গিতমাত্র আছে। নমুনা-স্বরূপ বলা চলে—যোগ কী তাই বোঝাতে বলা হয়েছে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ'। গোপীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী তার বঙ্গানুবাদ করেছেন—'চিত্তবৃত্তিসমূহ নিঃশেষরূপে স্বতঃরোধ হওয়ার নাম যোগ।' সন্তদাস বাবাজীর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যায় বিষয়টি অনেক বিস্তারিত রূপে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। স্বামী প্রভবানন্দ এবং রামকৃষ্ণ জীবনীকার ক্রিস্টোফার ইশারউড পাতঞ্জলের যোগ-সূত্র সরল ইংরাজিতেও অনুবাদ করেছেন। কিন্তু কোনো গ্রন্থকার বা কোনো সিদ্ধ যোগী বলেন নি গ্রন্থপাঠ করেই যোগসাধনা করা যায়। বরং প্রকৃত সত্য হল, কেবল গ্রন্থপাঠ করে যোগসাধনায় রত হওয়া, এমনকী তার প্রাথমিক কাজ প্রাণায়াম অভ্যাস করাও দুরূহ। উপযুক্ত গুরুর কাছে তা হাতেনাতে শেখা দরকার। না হলে চেষ্টা ব্যর্থ হবে হোক, তার থেকেও চিন্তার কথা, ভুলপথে অগ্রসর হলে বিপদ ঘটবার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

তবে উপযুক্ত গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে, তাঁর নিকট নিয়মিত যোগাভ্যাস শিক্ষা করলে যে সুফল পাওয়া যায় তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি দেখেছি কলকাতায় একজন গৃহী সন্ন্যাসীর মধ্যে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, উচ্চতম ডিগ্রিধারী। আবার সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং প্রকৃত শক্তিশালী কবি। যোগসাধনায় তিনি সমাধিস্থ হতেন। ৯২ বৎসর বয়সে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালেন, তিন-জন স্পেশালিস্ট সব রকমে পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁকে দাহ করতে নেওয়া গেল না। মৃতদেহের পাশে তিন চিকিৎসক (একজন তাঁর পুত্র, একজন ভাগিনেয়, অন্যজন তাঁর বন্ধুপুত্র) সারা রাত বসে রইলেন। শেষ রাতে তাঁর দেহে জীবনলক্ষণ ফিরে এলে সকালে তাঁর জ্ঞান ফিরল। তৃতীয় দিনে তিনি সজাগ হয়ে দেশের খবর জানতে চাইলে অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে পুলিশ-অভিযানের কথা শুনে পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর স্বর্ণমন্দির দর্শনের স্মৃতিচারণ করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে গুরু গ্রন্থসাহেবের কতিপয় শ্লোক মুখস্থ বলে গেলেন। একজন সাধকের মুখে শুনলাম—এ রোগী মহাচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন, তাই চেতনা ফিরবার পরে তাঁর স্মৃতিশক্তিও ফিরে এসেছে। সাধারণ রোগী হলে, হার্টবীট বন্ধ হবার পর চেতনা ফিরলেও স্মৃতি ফিরত না, vegetable life হয়ে যেত।

এই ঘটনার পর তিনি আরও এক বছর সুস্থ অবস্থায় যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। পরে ৯৩ বছর বয়সে দেহ রাখেন।

তাঁর কাছেই শুনেছি, গীতা ও উপনিষদেও যোগ-সাধনার বিষয় আছে, এমনকী তন্ত্রশাস্ত্রেও যোগসাধনা সম্ভব। আর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত উক্তি—'যত মত তত পথ' যোগসাধনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সব পথেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা কিন্তু মুখ্যত তাঁর স্বীয় চেষ্টায়। শাস্ত্রগ্রন্থ গীতা-উপনিষদের মধ্যেই তিনি পথ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং কোনো গুরুর নিকট তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানবার দরকার হয় নি। যখন তিনি যোগসাধনায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন তখন লেলে-নামক যোগীর কিছু উপদেশ অনুসরণ করেন। আর তাতেই তাঁর এত দ্রুত উন্নতি ঘটে যা দেখে লেলে নিজেই বিস্মিত হয়ে বলেন, শ্রীঅরবিন্দ নিজের বিবেকের নির্দেশমতো চললেই সিদ্ধিলাভ করবেন, তাঁর কোনো গুরুর প্রয়োজন হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ যে শুধু অপার্থিব শক্তি নিয়েই জন্মে ছিলেন তাই নয়, তিনি ভারতীয় যোগসাধনায় সিদ্ধি-লাভের যেসব স্তর বর্ণিত আছে তার পরেও আরও কতিপয় স্তর ঊর্ধ্বে উঠে, ঊর্ধ্বলোক হতে ঐশ্বরিক শক্তি আবাহন করে মর্তে নামিয়ে এনে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে দিব্যজীবন লাভের ব্যবস্থা করতে সাধনা করে-ছিলেন। যোগীরা সমাধিস্থ হয়ে তুরীয় আনন্দে বিভোর থাকেন, তাঁদের সাধনা কেবল তাঁদের নিজ-নিজ আত্মার তৃপ্তির ও পরমানন্দ লাভের সাধনা। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সেখানেই থেমে থাকে নি, তা চলে গেছে আরও তিনটি স্তর ঊর্ধ্বে এবং সব-কিছুই সম্ভব হয়েছে তাঁর একক প্রচেষ্টায়, ঐকান্তিকভাবে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভারতীয় যোগ-সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির তিনি সমন্বয় সাধন করছেন, তাই তাঁর পদ্ধতির নাম—যোগসমন্বয় (The Synthesis of Yoga)। তাঁর মতে সারা জীবনই যোগ (All life is Yoga)-এ একেবারে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ—যা সত্যই পৃথিবীকে দিব্যজীবনের অধিকার করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর অনুরাগীরাও সেই বিশ্বাসই পোষণ করেন। হীজ তাঁর গ্রন্থে এই দুরূহ সাধনার বিষয়ে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

মানুষের হাতে এখন পারমাণবিক শক্তি বশ্যতা স্বীকার করেছে। মানুষের আবিষ্কৃত কমপিউটারযন্ত্র মানুষের শারীরিক দক্ষতার কোটি গুণ বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে হয়তো কালক্রমে মানুষের সৃষ্ট কমপিউটার কৃত্রিম বুদ্ধি পর্যন্ত লাভ করবে। কিন্তু

Sri Aurobindo—A Brief Biography by Peter Heehs. Oxford University Press. Rs. 65.

এত করেও কি মানুষ আত্মস্থ হতে পেরেছে? পেয়েছে কি আনন্দের অধিকার, শান্তির আশ্রয়?

আমেরিকার ফ্লোরিডায় ডিজনেওয়ার্ল্ড-এ 'এপকট সেণ্টার' দেখলাম। EPCOT কথাটির অর্থ হল Experimental Prototype Community of Tomorrow ভবিষ্যৎ কালে মানুষের জীবনের সুখ-সুবিধার একটি পরীক্ষামূলক নিদর্শন। বিবিধ প্রকার প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর সমাবেশ-সমারোহ, যা করতে বহু বিলিয়ন ডলার ব্যয়িত হয়েছে।

কিন্তু তাতে মানুষের মন নিয়ে কিছু ভাবনা নেই। অথচ এই বিচিত্র কলকোলাহল হতে দূরে, নিভৃতে, সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে আত্মানুসন্ধান করে এই ক্ষুদ্র কলেবর নিয়েই মানুষ কী অমিত শক্তির অধিকারী হতে পারে তার সন্ধান তো এটম-শক্তি, কমপিউটার বা এপকট দিতে পারবে না। তা একান্তভাবেই মানুষের আত্মোপলব্ধির ব্যাপার। আর সেখানেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সাধনা কোনো স্থূল শক্তি লাভের জন্য নয়, কেবল নিজের মুক্তির জন্যও নয়, তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবন, সমষ্টি-জীবন, এমনকী জাগতিক জীবনকেই দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করা। তাঁর সাধনা নির্বাণ বা স্বর্গ লাভের জন্য নয়, বরং কাল্পনিক স্বর্গকে বাস্তবে নামিয়ে এনে এই ধরণীর ধূলিকেই মধুময় করে এখানেই দিব্যজীবন লাভ করা। হাজ তাঁর গ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের সেই চিত্রটিই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সেজন্য তিনি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন লাভের যোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ-অনুরাগী-মাত্রেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠে আনন্দ পাবেন বলে মনে করি। পিটার নিজেকে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত না বললেও এবং পুরাণী বা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মতো প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও শ্রীঅরবিন্দকে সঠিকভাবে অনুভব করেছেন। এ বড়ো কম কথা নয়।

'সাঙ্গ নাহি হয়'

সনাতন মিত্র

কথাটা কে বলেছিলেন মনে করতে পারছি না; সম্ভবত কোনো কবিই বলে থাকবেন। কথাটা এই-রকম : কবিতা কখনও শেষ হয় না, পরিত্যক্ত হয়। Never finished, abandoned। তার মানে বোধহয় এই যে, করি যখন দেখেন কবিতাটি নিয়ে আর কিছু করা যাচ্ছে না, তাকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা যাচ্ছে না তাঁর মানসপ্রতিমার, বাক্যকে অবলম্বন করে আবার বাক্যেরই বাধা দু-হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে-সরিয়ে বস্তুর সঙ্গে তার সান্নিধ্য আর ঘনিষ্ঠতর করা যাচ্ছে না, তখন নাচার হয়ে তিনি বলেন, ও যা আছে তাই থাক।

শুধু কবিতা কেন, গল্প উপন্যাস ইত্যাদির বেলাতেও, যা লেখা হল তার পেছনে যা লেখা গেল না, তার একটা অশরীরী উপস্থিতি ঈষৎ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লেখকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। পাঠকও, ডিকেনসের সেই কালজয়ী বালকের মতো, বলতে পারে—আরও দাও। অবশ্য এটা ঠিক পরিমাণের কম-বেশির কথা নয়—সত্যের মুখ আরেকটু উন্মোচিত হোক, পূর্ণতর অবয়ব পরিগ্রহ করুক লেখকের কল্পলোক, এই কথা। এবং এ লেখকের বিরুদ্ধে কার্পণ্যের কোনো অভিযোগেরও কথা নয়। ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে গেলে ছেনি দিয়ে পাথরটাকে কাটতেই হয়, তার অনেকটা বাদ দিতেই হয়, তারপর যা বাকি থাকল, তাই হল মূর্তি।

সাজঘর—হুমায়ুন আহমেদ। প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

আকাশজোড়া মেঘ—হুমায়ুন আহমেদ। প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা। পঁয়ষট্টি টাকা।

নিষাদ—হুমায়ুন আহমেদ। প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

কথাশিল্পও গড়ে তুলতে হয় অভিজ্ঞতার বস্তুপুঞ্জ থেকে ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে। একটু অপরিতৃপ্তির ভাব আসে, যখন মনে হয়, কী ক্ষতি ছিল অমস্থণ অনমনীয় বাস্তবের আকৃতিটা যদি আরও একটু অনুভবগ্রাহ্য হয়ে উঠত?

যেসব লেখক পাঠককে অলিভার টুইস্টের মতো অভুক্ত রেখে দেন, তাঁদের লেখা সম্পর্কে এরকম অনুযোগ তোলা নিরর্থক। হুমায়ুন আহমেদ জানেন কী করে অঞ্জলি ভরে দিতে হয়। তাঁর উপন্যাসে বাইরের আয়োজন কম, অন্তরের ঐশ্বর্য এত বেশি যে, পড়া শেষ হবার পরও মনে হয় কথা ফুরোল না, মানুষের জীবনের, মানুষের মনোজগতের রহস্যের আরও অসংখ্য দরজা থেকে গেল; তার কোনোটা আধো-খোলা, কোনোটায় সামান্য একটু ফাঁক, কোনোটা বন্ধ। এতে অতৃপ্তি জন্মায় না, বোধ জন্মায় একটা অপরিমেয়তার, দুরবগাহতার, অন্তহীন বিমিশ্রতার এবং সর্বোপরি অপরিজ্ঞেয়তার। যে জানার পর এই বোধ জন্মায় যে, জানা যায় না, সেইটাই আসল জানা, যে পাওয়ার পর এই বোধ জন্মায় যে, পাওয়া যায় না, সেইটাই আসল পাওয়া : 'এই দুনিয়ার হাটে / আমার যতই দিবস কাটে, / আমার যতই দু-হাত ভরে ওঠে ধনে / তবু তোমায় আমি পাই নি,/যেন সে কথা রয় মনে / যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।'

যে তিনখানি উপন্যাস নিয়ে এই আলোচনা তার কোনোটিই আকারে বড়ো নয়, পটভূমি আমাদের চেনা সংসারের বাইরে খুব বেশি দূর বিস্তৃত নয় কোনোটিরই, তেমন অচেনা নয় প্রায় কোনো চরিত্র, অজানা নয় তাদের কোনো সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা, চাওয়া এবং পাওয়া, কিংবা না-পাওয়া। একটি উপন্যাসের একটি পরিবার ধনী, আর প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত; আরেকটি উপন্যাসে, পাদপ্রদীপের জগতের পিছনে যেখানে সলতে পাকানোর কাজ চলে, আমাদের কতকটা অপরিচিত সেই জগতে আমরা উপস্থিত হই। কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ পাঠক সাধারণের, অভিজ্ঞতার পরিধির একটু বাইরে মনে হলেও, সেই বিপুল বিত্তের অধিকারী পরিবারটির জীবন এবং সেই সাজঘরের জীবন যাদের নিয়ে, সমবেদনা দিয়ে বুঝতে পারি, তারা আমরাই। আমাদের কাহিনী, আমাদেরই কথা। কিন্তু অসাধারণ। অসাধারণ এইজন্যে যে, একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে আমরাই অসাধারণ। যেমন করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে হিরে থেকে আলো ঠিকরে বেরোয়। দৈনন্দিন জীবনের সামান্য ঘটনা, ঘটনাস্রোতে কোথাও অল্প একটু বাঁক, এমনকী একটি কথা, একটি নীরবতা উশকে দেয় একান্ত কাছের মানুষের সম্পর্কেও নতুন ভাবনা, এবং সেই কাছের মানুষদের নিয়ে আমাদের যে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, উচ্চকিত করে তোলে তার সম্পর্কে নতুন বোধ, নতুন চেতনা। তখন বুঝি আমাদের পরিচিত জগৎ প্রসারিত হয়ে আছে পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর।

"সাজঘর"-এর প্রধান পাত্র-পাত্রীরা একটি শৌখিন নাট্যদলের অভিনেতা-অভিনেত্রী। অভিনয় তাদের পেশা না হলেও, এই উপন্যাসে যতক্ষণ তাদের দেখি, নিজের-নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তারা, মনে হয়, থিয়েটার-কেন্দ্রিক কক্ষপথেই আবর্তিত হচ্ছে। আসিফ এবং তার স্ত্রী লীনা এদের নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে, উপন্যাসেও তারাই প্রধান চরিত্র। আসিফ শক্তিমান অভিনেতা, থিয়েটার তার কাছে নিছক শখের ব্যাপার নয়, থিয়েটার তার রক্তে, অভিনয় তার ব্যক্তিসত্তার ডেফিনিশন, সংজ্ঞার্থ। আসিফের অভিনয়ের আকর্ষণই লীনাকে তার জেলা-জজ বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। এখন লীনার সন্দেহ হয়, আসিফের সবই কি অভিনয়? ভালোবাসা, কাছে টানা, হাসি? এখানে লীনার পর্যবেক্ষণটির তাৎপর্য কম নয়, 'বিয়ের দ্বিতীয় বছরে সন্দেহটা তার প্রথম হল। সে লক্ষ করল ভালোবাসা-বাসির সময় আসিফ একেক সময়

একেক রকম আচরণ করে। যেন সে ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছে। একজন মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন আচরণ করতে পারে, কিন্তু তার মূল সুরটি কিছুতেই কাটবে না। মূলসুর অবশ্যই বজায় থাকবে, কিন্তু আসিফের বেলায় তা থাকে না। পুরো ব্যাপারটাই তার বেলায় বদলে যায়। অভিনয় ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়।'

তার একটু পরেই দুজনে কথোপকথন :

'তুমি কেন জানি আজ অতিরিক্ত রকমের গম্ভীর হয়ে আছ। কী ব্যাপার, লীনা?'

লীনা বলল, 'একটু অপেক্ষা করো। ব্যাগটা গুছিয়ে নিই, তারপর হাসিমুখে তোমার সঙ্গে গল্প করব। তুমি চাইলে জানালা বন্ধ করে, দরজায় পর্দা ফেলে, ঘর একটু আঁধার করে নেব। তারপর দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুঃখে দুঃখী, আঁধারে ঢাকিয়া গেছে আর সব।'

(এই যদি লীনার স্মৃতিশক্তি এবং ছন্দোজ্ঞানের নমুনা হয়, থিয়েটার তার জন্যে নয়, তবে এ ত্রুটি লেখকের ইচ্ছাকৃত কিনা সন্দেহ)। উপন্যাসের প্রথম দিকে নাট্যপরিচালক যখন বলেন, আমরা সবাই বাস্তব জীবনে অহরহ অভিনয় করে চলেছি, তখন সে কথাটায় আমরা তত কান দিই নি, কেননা, খুব একটা নতুন কথা বলে সেটা আমাদের কানে ঠেকে নি। এবার যখন শুনছি, তার মধ্যে বুড়িগঙ্গা দিয়ে বেশ খানিকটা জল বয়ে গিয়েছে। যেমন থিয়েটারের ওপর জীবনের, তেমনি থিয়েটারের ছায়া নিবিড় হয়ে পড়েছে জীবনের উপর। আসিফ ও লীনা, এবং বিশেষ করে আসিফ, দেখছে থিয়েটারের জট জীবন থেকে ছাড়ানো বড়ো সহজ নয়। সে জট টেনে ছিঁড়তে গেলে নিজেরও বেশ খানিকটা ছিঁড়ে আসে তার সঙ্গে। দলের আরেক অভিনেত্রী, সফল অভিনেত্রী, প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী পুষ্পকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, নিজের সত্তার একটা ভগ্নাংশ নিয়ে সে বেরিয়ে এল থিয়েটারের জগৎ থেকে। নানা জটিল জিজ্ঞাসার ঘূর্ণাবর্তে রেখে গেল পাঠককে। কোন্‌টা আসল আমি, আমার কোন্‌টুকু আসল, আমার অভিনয় যতটা টেকনিকের ব্যাপার, জীবনও কি তাই? আগেই বলেছি, এ অতৃপ্তি নয়, বরং, যে জীবনে আর্টের পাত্র উপচে পড়ে, তারই সম্পর্কে একটা বোধ। তবে কিছু-কিছু অতৃপ্তিও রেখে গেছেন লেখক। মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে, তুলির আরও দু-চারটি আঁচড় প্রয়োজন ছিল। আবার একটু অনবধানতার চিহ্ন রেখে গেছেন এখানে-ওখানে। রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতিটির কথা আগেই বলেছি। আরও আছে। আবার মনে হয়, অতি অল্প আয়াসেই তিনি এক-একটি গোটা মানুষ, একটি গোটা মানবিক সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যেমন হাসমত ও বেণু। তারা নিজেদের ভার দিয়ে মাটিতে গেঁথে রেখেছে এই উপন্যাসটিকে।

"নিষাদ" আরও একটু অস্ফুট। পড়তে-পড়তে মনে হয়, যা বলা হল তার চেয়ে যা বলা হল না, কিংবা বলা গেল না, তারই এতে প্রাধান্য। জে. বি. প্রিস্টলের "সময়" নিয়ে পরীক্ষামূলক দু-একটি নাটকের কথা পাঠকের মনে পড়তে পারে। একই সময়ে একই সঙ্গে ছুটো পরস্পরবিচ্ছিন্ন সমান্তরাল কালস্রোত বয়ে চলেছে, কোনো একটি মুহূর্তে তারা আলাদা হয়ে যায় এবং আলাদাভাবেই প্রবাহিত হতে থাকে নিজের-নিজের পথে। চিকিৎসাসঙ্কটের কারণে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুনিরের বাবা মারা গেলেন, আবার সেই সঙ্কট কাটিয়ে অন্য এক সময়ের জগতে বেঁচেও উঠলেন। বেচারি মুনির এই দুই কালস্রোতের টানাটানিতে বিপর্যস্ত। মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক মিসির আলি খুব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করেন। এবং মনে হয়, বড়ো সহজে বুঝেও ফেলেন। একজন বিজ্ঞানীর মনে জিজ্ঞাসার এত অভাব পাঠককে পীড়িত করে। অথচ, সেসব প্রশ্নের কথা বাদ দিলে, মুনির এক প্রহেলিকার মধ্যে দাঁড়িয়েও বড়ো বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র। তার

ব্যাধিটা আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও, তার বেদনা বড়ো সত্য হয়ে বাজে।

কিন্তু এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে পাঠকের মানসিক শান্তি আর স্বস্তিতে সবচেয়ে বিঘ্ন ঘটায় "আকাশজোড়া মেঘ"-এর অপালা। অনেকদিন আগে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যাকে তিনি বলেছিলেন 'ঘৃণামিশ্রিত প্রেম', তাই নিয়ে একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন "নীলাঙ্গুরীয়"। বিভূতি মুখোপাধ্যায় ভালো লেখক, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু ওই যে বিশেষ তত্ত্বটি, যা তাঁকে হয়তো আকৃষ্ট করে থাকবে, তার মধ্যে অবগাহন করতে গিয়ে তিনি বেশি দূর এগোতে পারেন নি, কেননা সে চেষ্টা তাঁর সাহিত্যিক স্বভাবের বিরোধী ছিল। হুমায়ুন আহমেদ নির্মম, নির্লিপ্ত এবং নির্বিকার। অপালার সম্পর্কেও 'ঘৃণামিশ্রিত প্রেম' কথাটা কতদূর খাটে বলা কঠিন। কী একটা অতিরিক্ত রকমের স্পর্শকাতরতা আছে তার মধ্যে, এবং তারই একটা অপরিহার্য অনুষঙ্গ আত্মরক্ষার একটি বর্ম।

'পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ফিরোজ মনে-মনে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। চমৎকার মেয়েগুলি সব এমন-এমন জায়গায় থাকে যে, ইচ্ছা করলেই হুট করে এদের কাছে যাওয়া যায় না। দূর থেকে এদের দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে হয় এবং মনে-মনে বলতে হয়—আহা এরা কি সুখেই না আছে।'

অপালা সুখে নেই, তাই তার কাছে হুট করে যাওয়া যায় না। আর, সেই কারণেই কি, নিজের ভিতরকার গভীর কোনো অসুখের তাড়নাতেই কি, তার অন্যের আত্মরক্ষার বর্ম ভেদ করার খেলা? তার বাবা আসলে তার বাবা নন, তার মা তার মা নন, তাই কি অত নিবিড় আশ্লেষে তাঁদেরকে (বিশেষ করে পালক পিতাকে) তার আঁকড়ে ধরা? আসলে কে সে? কোথায় তার আত্মপরিচয়ের পায়ের তলাকার মাটি? যে জগৎটাকে সে নিজের বলে জেনে এসেছে, সেটাও বাইরের আঘাতে থর-থর করে কাঁপছে, শ্রমিক-আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগছে তার 'বাবা'-র কারখানায়। তাতে হয়তো তেমন কিছু হত না, যদি না সেই সঙ্গে তার 'আমি'-টা চুর-চুর হয়ে ভেঙে পড়তে থাকত। এবং, তবুও হয়তো কোনোরকমের একটা জোড়াতালি দিয়ে নিজের অস্তিত্বটা সে টিকিয়ে রাখতে পারত, যদি না ঠিক সেই সময়ে ফিরোজ তার জীবনে এসে পড়ত। ফিরোজ আর লতিফাকে পাশাপাশি দেখে সে বুঝল, ফিরোজ লতিফার হাত ধরে মানুষের শেষ আশ্রয় এই মর্ত-ভূমিতেই ভালোবাসার একটি বাসার সন্ধান পেয়েছে। অপালা বুঝল, সেরকম কোনো আশ্রয় তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। আত্মহত্যা ছাড়া তখন আর তার করবার কী থাকল?

যা কঠিন, তাই ভঙ্গুর।

অপালার কাছে আসা যায় না, ফিরোজ খুব কাছে যেতে পারে নি, আমরাও একটু দূরেই থেকে যাই শেষ পর্যন্ত। অপালার এই ট্র্যাজেডি, যার বাইরের আকৃতি, যাকে বলে contour, সেটা খুব স্পষ্ট করে আয়ত্ত করবার বৃথা চেষ্টা না করাই ভালো, লেখক এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে অপ্রকাশের বেদনা কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। 'হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়, আধোখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়...'

ইতিহাসের ছায়াতপে

কিরণশঙ্কর মৈত্র

কিছুদিন আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "জয়াপীড়" গ্রন্থটি পড়েছিলাম। ইতিহাস-কিংবদন্তী-আশ্রিত ঝরঝরে ভাষায় লেখা চমৎকার আকর্ষণীয় এক উপন্যাস। গৌড়বঙ্গে যখন অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়—কল্হন রচিত সংস্কৃত ভাষায় "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থে বর্ণিত সেই অষ্টম শতাব্দীর কাহিনীসূত্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে "জয়াপীড়"-এর আখ্যান।

ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের "দেবী ও দানবী"র কাহিনীও রচিত হয়েছে কল্হনের "রাজতরঙ্গিণী" গ্রন্থের দশম শতাব্দীর এক কাহিনীকে অবলম্বন করে। বস্তুত দেবী ও দানবী বলে কথিত এই রহস্যময়ী রমণী ছিলেন কাশ্মীরের মহারানী দিদ্দা। 'দিদ্দা' শব্দের অর্থ বড়দিদি।

হাজার বছর আগে ঐশ্বর্যময় উদ্‌ভাণ্ডপুরের রাজা ছিলেন খস-জাতিভুক্ত দিদ্দার মাতামহ মহারাজ শ্রীভীমদেব। প্রাচীন শিলালেখে এই বংশের উল্লেখ বর্তমান। সিন্ধুনদের পশ্চিমে এই সুরম্য নগরী সেকালে ছিল বহু সৌধ-হর্ম্য-বিপণিতে পূর্ণ। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে এবং বরফাবৃত উচ্চ গিরিপথ দ্বারা সংরক্ষিত এই রাজ্যটি ছিল উর্বর ও জনবহুল। বালিকাবয়স থেকেই, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, দিদ্দা শুধু রাজমহিষী নয়—রাজেশ্বরী হবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প করেন।

দিদ্দা অপরূপা রূপসী হলেও ছিলেন খঞ্জ। কিন্তু দৈহিক অপূর্ণতা তাঁর উচ্চাশাকে খর্ব করতে পারে নি। একমুখী সঙ্কল্পে তিনি আপন অভীষ্ট পথে এগিয়ে গেছেন। নিষ্ঠুর ও নৃশংস ভাবে পথের সব বাধাকে দমন ও দূর করেছেন তিনি।

অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে এই অসামান্যা রূপসী ও অতি আকর্ষণীয়া যৌবনবতী রাজকুমারী বরমাল্য অর্পণ করেছেন লম্পট বহুকামী অপদার্থ উচ্ছৃঙ্খল কাশ্মীররাজ ক্ষেমগুপ্তের গলায়। পতির জীবিতাবস্থায় বহিরঙ্গে পতিব্রতা থাকলেও ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পরে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে বহু পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে দ্বিধা করেন নি। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও সুশাসিকা। তাঁর শাসনকৌশলে সর্বপ্রকার বিদ্রোহ বিধ্বস্ত হয়েছে, বন্ধ হয়েছে দরিদ্রপ্রজাশোষণ, রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ়।

রাজকুমারীপর্ব, রাজমহিষীপর্ব, রাজমাতাপর্ব, রাজপিতামহীপর্ব ও রাজেশ্বরীপর্ব—এই পাঁচটি পর্বতরঙ্গের মাধ্যমে রহস্যময়ী দিদ্দার রোমাঞ্চকর কাহিনী ঔপন্যাসিক দক্ষতায় সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন ড. চন্দ্র।

"দেবী ও দানবী" একান্তভাবেই দিদ্দার কাহিনী এবং সমস্ত গ্রন্থে তাঁরই একচ্ছত্রাধিপত্য। তবু তাঁকে কেন্দ্র করে যে-কয়টি চরিত্র আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য তুঙ্গ, বল্লা, ভট্ট ফাল্গুন, নরবাহন প্রমুখ।

সুধীর মৈত্রের আঁকা বর্ণময় প্রচ্ছদটি চমৎকার।

খুব টানটান, স্মার্ট, আধুনিক রচনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় "লোককীর্তন"-এর গল্পগুলির মধ্যে। কাহিনীবিন্যাস ও বিশ্লেষণপ্রকরণ বারবার চমকিত ও বিস্মিত করে। স্বভাবতই গল্পগুলি সজাগ, সচেতন মনে পঠনীয়, চিরাচরিত কাহিনীপ্রাধান্যের গড্ডলিকা-প্রবাহে গল্পকার কখনও গা ভাসাতে দেন না।

প্রায় সব গল্পেরই পটভূমি গ্রামবাঙলা—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম; কুশীলব অনেক ক্ষেত্রে

দেবী ও দানবী—ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। রূপা, কলকাতা-৭৩। চল্লিশ টাকা।

লোক-কীর্তন—রাধাপ্রসাদ ঘোষাল। রক্তস্বাক্ষর পাবলিকেশন। কলকাতা-১১। পনেরো টাকা।

জরিনা, এ আমার পাপ—আবু আতাহার। প্রভিনসিয়াল বুক এজেন্সি। কলকাতা-৯। বারো টাকা।

বাগদি-ডোম-কামার-কুষক। অতীত লোকাচারের প্রেক্ষাপটে আধুনিক আর্থ-সামাজিক জনজীবনের বৈষম্যসঙ্কুল চিত্র বিভিন্ন কাহিনীতে মুন্সীয়ানার সঙ্গে চিত্রিত; সেই সঙ্গে সংযত লিপিকুশলতায় বিধৃত অন্তরজীবনের কামনা-বাসনা-লোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

বৃক্ষপ্রেমিক এক নিসর্গ-অনুরাগী মানুষের কথা "ভূমিপুত্র" গল্পে। অনুভব করা যায়—লেখক গ্রাম-জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন অতলান্ত সহানুভূতির সঙ্গে। ফলত, এক আন্তরিক অন্তরঙ্গ আলেখ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—যার পরিচয় "রামায়ণ" গল্পেও।

বাঁজা (?) বউ ক্ষেমি রামা ডোমকে ছেড়ে চলে গেছে। ক্ষেমিকে আবার 'নিকা' করেছে রামারই বন্ধু ইয়াকুব। সেখানে চার বছরে সে দুই যমজ পুত্রের জন্ম দিয়েছে। ক্ষেমির নতুন সংসার রামা একদিন দেখে আসে সোনাপোতা গিয়ে। ক্ষেমি তাকে জানায় —ইয়াকুব খুব মদ খায়, তাকে ভীষণ মারে। কিন্তু ক্ষেমিকে আবার উদ্ধার করার ইচ্ছে স্বপ্নই থেকে যায় রামার জীবনে। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় এই কাহিনী এক নব-'রামায়ণ'।

"সাধনমার্গ" গল্পে প্রেমদাসী ও নবীনদাস—এই দুই বাউল বৈষ্ণবী-বৈষ্ণবের আধুনিক জীবনের প্রেক্ষাপটে মরমি জীবনগাথা।

সম্ভবত সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠগল্প "অকালবোধন"। একটি নারকেল গাছকে কেন্দ্র করে গ্রামজীবনের অতীত ঐতিহ্য, জ্ঞাতিবিরোধ, বর্তমানের কলুষিত সামাজিক পরিমণ্ডল, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কোন্দল চমৎকারভাবে প্রকট হয়েছে। সর্বোপরি, সর্বংসহা প্রকৃতি যেন নিঃশব্দে মানুষের আজব কাণ্ড-কারখানা নিরীক্ষণ করে চলেছেন।

চমৎকার লেখকের প্রকাশভঙ্গি এবং লিখনশৈলী। জীবনের গভীরে অবগাহন ক'রে তিনি বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপহার দেবেন অনেক মণিমুক্তো —এমন আশা করাই যেতে পারে।

আবু আতাহারের অন্য কোনো লেখা বর্তমান আলোচকের আগে পড়া হয় নি। "জরিনা, এ আমার পাপ" গল্পসংগ্রহে তাঁর যে মুক্তমন, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতাবাদী মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ভূমিকায় লেখকের এ বক্তব্যও দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার্য যে 'মধ্যবিত্ত মুসলমান আর মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে শুধু ধর্ম ছাড়া কোথাও এতটুকু তফাত নেই।'

দশটি গল্প রয়েছে সঙ্কলনটিতে। কয়েকটি গল্পে লেখক মুসলমান ও অ্যাংলো-ইনডিয়ান সমাজের চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। শীর্ষনাম গল্পটিতে সুন্দরী, শিক্ষিতা তরুণীকে বিবাহের সঙ্গে-সঙ্গে যৌতুক-গ্রহণের গ্লানিবোধের কথা অভিব্যক্ত যা 'পাপ' বলে অভিহিত।

"দ্বিতীয় জীবন" গল্পে জীবনেরই এক বিদ্রূপ। স্টেনো ইশিতা (শুদ্ধ বানান—ঈশিতা) যখন অফিসে বসের সঙ্গে প্রমোদ-বিহারের আহ্বান উপেক্ষা ক'রে ঘরে ফিরছিল, তখন কার্জন পার্কের কাছে সে তার স্বামীকে দেখতে পায় অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে অন্ধকারে ঘনিষ্ঠ দেহের অন্তরঙ্গতায়।

কাহিনীবিন্যাসে তেমন বৈচিত্র্য না থাকলেও বর্তমানের ভেদবুদ্ধি-সাম্প্রদায়িকতা-বিষদুষ্ট তমসাঘন প্রহরে সবাই "মজিদ খাঁ লেন"-এর মতো গল্পকে স্বাগত জানাবেন।

সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠগল্প "স্বজনগৃহে" আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত এক অ্যাংলো-ইনডিয়ান বৃদ্ধের বেদনা রূপায়িত। আপনজন সবাই চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া। উইলিয়াম মার্টিন তখন ইমাম নামে একটি কিশোরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়ো হবার পরে সে-ও জাহাজে কাজ জুটিয়ে একদিন পাড়ি দিয়েছে বিদেশে। কিন্তু বৃদ্ধ উইলিয়াম তাঁর প্রিয় শহর কলকাতায় একা নন। পাড়ার ছেলেমেয়ে সবাই তাঁকে ভালো-

বাসে। 'অনাত্মীয় সবাই তবুও স্বজনে ভর্তি তাঁর এই গৃহ।'

লেখক শুধু সংবেদনশীল ও সমাজসচেতনই নন, চারিদিকের সাম্প্রদায়িক-ভাবনা-ক্লিষ্ট পরিবেশে বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে তিনি চিরন্তন মানবিকতারই জয় ঘোষণা করেছেন। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

কবিতার শরীরী প্রতিমা

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

সময়ের গ্রন্থিহীন বৃত্ত অজান্তেই শিল্পীকে আবৃত করে স্বগঠিত বলয়ের বল্মীকে। খুব গভীর সচেতনতায় কবিকর্মকে ভাঙতে হয় অন্য স্রোতের সন্ধানে। অন্যথা পূর্ণতার সমীপে পৌঁছনো যায় না। মন্থরতা ক্লান্তি আনে, আনে পাঠকের অনীহা। কবিতার বিকিরণ কমে আসে, পুনরুদ্দীপন জাগে না কবিতার প্রতিমায়। আনন্দের কবিতা তার ব্যতিক্রম। 'এখন সময় হ'লো চেয়ে ছ্যাখো উত্তরপুরুষ / শস্যে মাঠে সমবেত প্লাবনে ঝঞ্ঝায় / এখন সময় হলো চেয়ে ছ্যাখো দিগন্তে কিংশুক…'। তাঁর কবিতায় বোধ ও চিত্রল রেখার দীপ্তি খেলা করে, যখন তিনি লেখেন: 'তুমি হাওয়ার চুল ওড়ালে নদীর উপকূলে / সানকি থেকে ছড়ালো রোদ তোমার বাহুমূলে।' সময়ের গহন দূরত্ব ও বিলাসিনী প্রকৃতিকে তিনি ছড়িয়ে দেন ব্যাপক সংকেতময়তায়—'মিনিটে আলোকবর্ষ পরিমাপে চলে যাচ্ছো দূরে / তোমার বিভঙ্গ কাঁপছে কুয়াশায় সপ্তবর্ণ রেখা'। ক্বচিৎ আভাসিত দৃশ্যপটকে তিনি জ্ঞানাতীত চেতনায় নিয়ে যান। আনন্দর কবিতায় দেহজ ভালোবাসা ও প্যাশন আমরা তেমন পাই না। অথচ বিজ্ঞানী বিশ্লেষণ কবিতায় ভিন্ন আস্বাদ আনে. সমাজচেতনা হয়তো নেপথ্যে থাকে, যেমন 'ঘোড়া'। কখনো বা দার্শনিক কুয়াশা পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। অবশ্য 'রোদ্দুরের নরম আঁচ' থেকে বুদ্ধমূর্তি ও গান্ধারশিল্পের রোমানটিক আর্তি শেষ পর্যন্ত আমাদের উৎফুল্ল করে তোলে।

মণীন্দ্র গুপ্তর সাম্প্রতিক কবিতার বইটি পাঠককে সরাসরি এক অর্ধ-আলোকিত আচ্ছন্ন চেতনার জগতে নিয়ে যায়—যেখানে সম্মোহন হানা দেয়, কিন্তু মেধার রক্তসঞ্চালন থামে না। বিস্ময় থেকে তিনি অনায়াসে বিশ্লেষণে চলে যান। আমাদের বোধ জাগরিত থাকে। চারপাশের জাগতিক বস্তুনিচয়ের সঙ্গে অতিজাগতিক প্রতিভাসকে তিনি দক্ষতায় সেতুতে জুড়ে দেন। অসাধারণ চিত্রকল্পগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। 'গাছকে আছাড় দিয়ে ফেলেছে এমন নিচু খাদে / সেই ভূগর্ভের দেশে সাপ ও প্রেতাত্মা ছাড়া কারো পক্ষে নামা অসম্ভব' কিংবা 'রাত্রে শীত ও পাহাড় চাঁদের ছদিক ধ'রে কামড়ায়।' চিত্রময়তায় তিনি শক্তিমান—'কিন্তু যা নিয়ে ফিরলে তার সংজ্ঞা জানো? শুধু স্মৃতি—যেন জলের তলার ছবি, বাকি যা তা অনির্বচনীয়।' অথবা 'জানলা দিয়ে অবলোকিতেশ্বরের আলো আসে।' 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় 'নির্বিকল্প সন্ধ্যার রেখা; কোন স্থির জ্ঞানী ভ্রমে ডুবে আছে: কত নিচে / বাদুড়মুখের কাছে আধখাওয়া ফলের মতন / দেখা যায় সবুজ পৃথিবী।' কিছু কবিতায় ক্রান্তদর্শী সত্যকে আশ্চর্য সরলতায় ধরেছে তাঁর লেখা—'আনন্দ, আমারও পিঠ ব্যথা করছে—কৃতকর্ম বড় বেশি ভারী।' তাঁর 'সন্ন্যাসী', 'বাড়ি', 'প্রকৃতিলীন' কবিতাগুলি অসামান্য। 'সংগ্রহ' কবিতাটি খুবই ভালো, কিন্তু শেষ পংক্তি দুটি 'চৌকো গর্তে খাপে খাপে লেগে যায় এমন একটি গোল দণ্ড / বা ভাই সি ভার্সা' কিঞ্চিৎ অসংলগ্ন মনে হয়েছে।

নিদ্রিত শিলালিপি—আনন্দ ঘোষহাজরা। বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯। ১৯৮৯। দশ টাকা।

ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষ—মণীন্দ্র গুপ্ত। পরমা, কলকাতা-১৯। ১৯৮৬। পাঁচ টাকা।

জলের করিডর ধ'রে—কেতকী কুশারী ডাইসন। নাভানা, কলকাতা-৭২। ১৯৮১। দশ টাকা।

ভাসমান চলে জলে স্থলে—সুরজিৎ ঘোষ। অন্বেষা, কলকাতা-৪২। ১৯৮৯। বারো টাকা।

হে নিদ্রাহীন—কালীকৃষ্ণ গুহ। নাভানা, কলকাতা-৭২। ১৯৮৮। দশ টাকা।

Rhapsodies to Runu and the Spring of Poetry Ablaze—Uttam Das. মহাদিগন্ত, বারুইপুর। ১৯৮৯। কুড়ি টাকা।

"জলের করিডর ধ'রে" হেঁটে গেলে কেতকীর কবিতায় 'সুড়ঙ্গের শেষে সকাল আছে' এই বিশ্বাস স্পষ্ট হয়। স্মৃতিকাতরতাময় এক রোমানটিক মেজাজ তাঁর কবিতার ফ্রেমে ধরা পড়ে। 'যখন আমরা চলে গেছি তখন সজনেগাছের মাথায় অন্ধকার ক'রে মেঘ জমবে…আমাদের জন্য…দাওয়ায় মাদুর রেখো,' কিংবা 'নালন্দার পথে' কবিতায় 'গৌতম কি বুঝে-ছিলেন…কিছু আর স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারি না… কিছু আবিল জলরাশি রয়ে গেছে' এরকম পংক্তিতে ধর্মের প্রান্ত পার হয়ে যে ধূসরতা, তা নিয়ে কবি বিব্রত। কিন্তু যখন শুনি—'সত্য কোথায়, বলতে পারো শুধিয়েছিলে, সত্যকথা বলার সাহস তুমিই দিলে' তখন কেতকীর কবিতার ভিত্তিভূমি স্থির থাকে—এমনকী 'ভ্রূণের মতো নির্ভাবনায় রক্ত কাড়ে'। তবে সুদূর অতীতে লেখা কিছু কবিতায় কিছু যৌবন-চাপল্য থেকেই যায়, যা আজ আর অভিপ্রেত নয়।

সুরজিৎ ঘোষ তাঁর সাম্প্রতিক 'ভাসান চলে জলে স্থলে' কবিতা-গ্রন্থে যথেষ্ট পরিণতির চিহ্ন রাখতে পেরেছেন। সমগ্র বইটিকে কবি তিনটি পর্যায়ে বেঁধেছেন: খোঁজা, শিল্প ও অসুখ। অবশ্য এই পর্ব-বিভাগ কাঙ্ক্ষিত কিনা সেটা বিতর্কিত বিষয়। যাই হোক,—'তোমার দু চোখে আছে ভালোবাসাধোয়া অশ্রুজল / দাও, তবে তাই হোক জীবনের নিতান্ত সম্বল।… / এবার ধ্যানের ঘরে দেখা হবে তোমার আমার'—এরকম গীতিময়তার আন্তরিক উচ্চারণ ভালোই। 'অন্ধকারে যদি তাকে খুঁজে পাই ভেবে / প্রতি রাতে নগ্ন আলোর জিভ থেকে আড়াল করেছি সেই মুখ' স্পর্শ করে। 'তবে নাও' কবিতায় এক সার্বিক আত্মনিবেদন শিখার মতো জ্বলে। নিয়তি, নারী নাকি নিরবধি সময়ের কাছে যা কিছু নশ্বর তাই দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো। অথবা 'অসংলগ্ন' কবিতায় নিদ্রাহীন রাতকাটে, কবে আসবে সেই শান্তির ঘুম। নিরঘুম রাত্রির শিয়রে কি শিল্পের পাখির ভোর অপেক্ষা করে? নীরব স্পর্শহীনতার মধ্য থেকেই জন্ম নেয় শিল্পের গান।

কালীকৃষ্ণর কবিতায় ছোট ছোট বৃত্তে অসংখ্য ছায়া-মেদুর বিষণ্ণতার অন্তরস্পর্শী অভিজ্ঞতা নুড়িপাথরের মতো ছড়ানো থাকে। মগ্নতা, শোক, গভীর উপলব্ধিময় উচ্চারণ সবই থাকে, কখনো বা মন্ত্রের শ্লোকের ভঙ্গিতে। কিন্তু সমগ্র বইটি জুড়ে কোনো স্থিরভূমি বা অন্তর্বলয় গড়ে ওঠে না। ফলত তাঁর কবিতা গভীর-সঞ্চারী হয়েও কোনো স্থায়ী অভিঘাত রাখে না। 'ছায়াপথ, প্রশ্নের অতীত বিশ্বলোক' আমাদের বড়ো ক্যানভাসে দাঁড় করিয়ে রেখে বিপন্ন করে তোলে। আমরা ক্ষণিক মুহূর্তগুলি জুড়ে এক স্থায়ী বোধের আশায় রইলাম। তবু তাঁর 'শান্তিনিকেতন ১৯৮৫' আমাদের অভিনন্দন দাবি করে।

উত্তম দাশের **Rhapsodies to Runu and the Spring of Poetry Ablaze** তাঁর 'রুনুকে' (১৯৮৩) থেকে গৃহীত কবিতাগুচ্ছের ইংরেজি অনুবাদ। দ্বিতীয় অংশে সঙ্কলিত কবির পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ। প্রথম অংশের ৭, ৯ এবং ১৭ সংখ্যক কবিতা আকর্ষণীয়। তিনটি কবিতারই উপজীব্য সংরক্ত ভালোবাসা। পুরুষমানসে নারী-

দেহবাসনা প্রকৃতির রূপ-ঐশ্বর্যের সঙ্গে মিশে আবেগের তীব্রতা ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু মূল কবিতার রম্যস্বাদ জটিল বিদেশী শব্দবন্ধে ব্যাহত। দ্বিতীয় অংশে কবির স্বচ্ছন্দ আর্তি, আশ্লেষ ও দর্শন পাঠককে স্পর্শ করবে। প্রথম কবিতাটিতে শব্দের অলিন্দ পার হয়ে ধ্বনির অতিমাত্রিক ব্যঞ্জনার অন্বেষণ আগ্রহ সঞ্চার করে। Stone কবিতায় মেঘবর্ষণবঞ্চিত দেহ অনুভূতিহীন শিলাখণ্ডে রূপান্তরিত প্রতীক নির্মাণ অনেকাংশে সফল। তবু বাঙলা কবিতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর ও বাতাবরণ অন্য ভাষার অবয়বে প্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তার করবে কিনা সংশয় জাগে।

মতামত

প্রসঙ্গ : কলকাতার দাঙ্গা

"চতুরঙ্গ" মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের চিঠি পড়েছি। নিঃসন্দেহে তাঁর লেখা সুখপাঠ্য, নতুন তথ্যও কিছু আছে। শ্রীঅশোক মিত্রের লেখাও পড়েছি। আমার সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা শ্রীমিত্রের মূল বক্তব্য সমর্থিত হয়। কেসির ডায়েরি, ব্রিটিশ কর্মচারীদের স্মৃতিকথা (ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি) এবং টেলর পেপার্স (সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ সেনটার, কেমব্রিজ) আমার তথ্যের উৎস।

শ্রী রায় লিখেছেন : সুরাবর্দীর চেয়ে যোগ্যতর মন্ত্রী সাইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ—এই দশ বছরে আমরা দেখি নি। কেসির ডায়েরি পড়ে মনে হয়—সুরাবর্দী দুর্নীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন না ; তাঁর সঙ্গে নাজিমউদ্দিনের বিবাদ অনেক দিন ধরে চলেছিল। ১৯৪৫ সালের বস্ত্রসংকটের সময় তিনি চোরাকারবারিদের মধ্যমণি বড়োবাজারের জয়পুরিয়ার উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী ছিলেন। কেসি লিখেছেন, টুলি (Tully) 'rejected Suhrawardy's suggestion of giving the whole business to Jaipuria who was regarded as the biggest of the blackmarketeers'। ১৯৪৫ সালের মার্চে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে। নাজিমুদ্দিন গভর্নর কেসিকে বলেন, এর মূলে ছিল মাড়োয়ারিদের টাকা। মাড়োয়ারিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন স্যর আবদুল জালিম গুজনাভি। কলকাতার দাঙ্গার সময় মাড়োয়ারি সম্প্রদায় সক্রিয় ছিল। মাড়োয়ারিদের ভূমিকা মনে রাখতে হয়।

নাজিমুদ্দিন বনাম সুরাবর্দীর ক্ষমতার লড়াইয়ের অবসান হয় ১৯৪৬ সালে, যখন সুরাবর্দী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দল পেয়েছিল মাত্র ৫টা আসন। ইতিমধ্যে এই দলে ভাঙন এসেছিল ; অনেক সদস্য লীগে যোগ দিয়ে সুরাবর্দীর মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রিসভা প্রসঙ্গে পি. ডি. মার্টিন (যিনি পরে বাঙলা সরকারের অতিরিক্ত সেক্রেটারি হয়েছিলেন) কিছু তথ্য দিয়েছেন। মন্ত্রীদের অনেকেই ছিলেন **'highly communal and hungry for the loaves and fishes of power'**। এই ব্যক্তিদের নিয়েই সুরাবর্দীর চলতে হয়েছিল।

১৬ই অগস্ট কলকাতায় দাঙ্গার পটভূমিকা তৈরি হচ্ছিল অনেক দিন ধরে। শ্রীরায় এর জন্য প্রধানত জিন্নার নীতিকে দায়ী করেছেন। অনেক লেখকের ধারণা (এঁদের মধ্যে প্রধান আয়েষা জালাল) জিন্না দলের উগ্রপন্থীদের চাপে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন।

কলকাতার দাঙ্গার ব্যাপারে সুরাবর্দীর ভূমিকা কী ছিল? "স্টেটসম্যান" পত্রিকা দাঙ্গার জন্য সুরাবর্দীকে দায়ী করেছিল। চব্বিশপরগনার জেলা শাসক এস. এম. স্টুয়ার্ট তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সুরাবর্দী 'নির্লজ্জের' মতো তাঁর কাছে জানতে চান কেন মুসলমানদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। স্টুয়ার্ট তাঁকে জানান যে শুধু হিন্দুরাই নিহত হচ্ছে, তাদেরই ধনসম্পত্তি লুট হচ্ছে। সুরাবর্দী দাঙ্গার প্রসার বন্ধ করতে তেমন চেষ্টা করেন নি। তিনি উভয় সংকটে পড়েন যখন মাড়োয়ারিরা আসরে নামে এবং মুসলমান-হত্যার তাণ্ডব শুরু হয়।

তদানীন্তন পুলিশের ইনসপেকটর-জেনারেল

এস. জি টেলর দাঙ্গার জন্য সুরাবর্দীকে দায়ী করেছেন। টেলর লিখেছেন : 'The Chief Minister's attitude during the rioting was reprehensible ··the Chief Minister made a tactical error in selecting Calcutta for his attack.' সুরাবর্দী বুঝতে পারেন নি "হিন্দুরা" কলকাতায় কত শক্তিশালী। সম্ভবত টেলর "হিন্দু" বলতে মাড়োয়ারিদের বুঝেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলকাতায় দাঙ্গার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯৪৭-এর ২৮শে মার্চ, যে দাঙ্গা চলেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের আগের দিন পর্যন্ত। সেই বিষণ্ণ পর্বে কলকাতায় ছুটে এলেন গান্ধী, উগ্র বামপন্থীরা এখনো যাঁর সমালোচনায় পঞ্চমুখ। এই দাঙ্গায় মাড়োয়ারিরা ছিল আরো সংগঠিত। তখন সুরাবর্দী গান্ধীভক্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সুনীল সেন

রসা রোড, কলকাতা-৩৩

আর একটু পরেই ও প্রবেশ করবে এক নতুন জীবনে...

'আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন'

কনের সাজে সজ্জিতা; সলজ্জ, চমৎকার রূপ। আশা ও আনন্দে থরথর হৃদয়। মা-বাবার মন কিন্তু শঙ্কায় দুরুদুরু। আয়োজনে ত্রুটি নেই কোনো; তবু তাঁদের চোখমুখের কী-হয় কী-হয় ভাব চোখ এড়ায় না কারও। সব আয়োজনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সকলের কাছে তাঁদের নিরুচ্চার প্রার্থনা—আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন। যেন ওর বিবাহিত জীবন সুখের হয়।

চিরন্তন এই রূপ ও প্রার্থনার সঙ্গে কে না পরিচিত! বিজলী গ্রীলও জানে, এই প্রার্থনা কতো গভীর, কতো আন্তরিক। তাই, যে-কোনো বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে অতিথি-অভ্যাগতদের নানা সুখাদ্য পরিবেশনের সময় তারাও ঢেলে দেয় মনপ্রাণ। যাতে সকলেই খুশী হন–যাতে সত্যি-সত্যিই ফলবতী হয়ে ওঠে এই প্রার্থনা।

বিজলী গ্রীল–বিবাহ কিংবা যে-কোনো উপলক্ষে কলকাতার সেরা কেটারার।

Bijoli Grill

৯ই রূপচাঁদ মুখার্জী লেন কলিকাতা ৭০০০২৫ ফোন: ৪৮-২৩৬০/৪৭-৩৯২০/৪৭-৪৪৯৮